শান্তিনিকেতন

(একাদশ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর
মূল্য চার আনা

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কান্তিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

শান্তিনিকেতন

রসের ধর্ম্ম

আমাদের ধর্ম্মসাধনায় দুটো দিক আছে একটা শক্তির দিক্, একটা রসের দিক্। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত এও ঠিক তেমনি।

শক্তির দিক্ হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলিনে। আমি যার কথা বলচি এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে— আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিষটি পৃথিবীর মত দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায় তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে—কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্তে, যে-সব জিনিষ সংসারের জোয়ারে-ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায় তাদেরই তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা কিছু হারায়, যা কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায় তার ক্ষতিকে এমনি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলি তার মনে হয় সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলি তার মনে

নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্ত্তি দেখ্‌তে পায় না। যে লোক ডুব জলে সাঁতার দেয়, যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি কলসি কলার ভেলা তার পরমধন—তার ভয় ভাবনা উদ্বেগের সীমা নেই। আর, যে ব্যক্তির পায়ের নীচে সুদৃঢ় মাটি আছে তারও হাঁড়ি কল্‌সির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়ি-কলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়—এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তাহলে তার যতই অভাব অসুবিধা হোক্ না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্ম্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে প্রত্যেক মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখ্‌তে পেলেও সে মনে মনে জানে ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি—বিরুদ্ধ ফল

পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড় জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্চে সেই বিশ্বাস যে মাটির উপরে আমাদের ধর্ম্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্চে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুনতে সহজ, এবং শোনবামাত্রই অনেকে হয় ত বলে উঠ্‌বেন যে, ঈশ্বর সত্য এ কথা ত আমরা অস্বীকার করিনে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারিনে। আমাদের মন সেই পর্য্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক না কেন, যিনি চরম সত্য পরম সত্তা তিনি আছেন, এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে, সে ব্যক্তি যেমন ভাবে জীবনের কাজ করে আমরা কি তেমন ভাবে করে থাকি?—আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন—সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারই আছেন—জীবনে যত উলটপালটই হোক্ এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্চে বিশ্বাসী—তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়াছেন এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে—এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত তাহলে ত এ একটি প্রস্তরময় ভয়ঙ্কর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে—সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্য-গতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতু পাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ

—তার চলা-ফেরা আসাযাওয়া মেলামেশায় আর অন্ত নেই।

রস জিনিষটি সচল ;—সে কঠিন নয় বলে, নম্র বলে, সর্ব্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে ; এইজন্তেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুল্‌চে—এইজন্তেই কেবলি সে আপনার অপূর্ব্বতা প্রকাশ করচে, এইজন্তেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্ম্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্বটি না রাখ্‌লে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেক সময় ধর্ম্মসাধনায় দেখা যায়

কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে—তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে ; সে অন্যকে আঘাত করে; তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে ; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না বলে কেবল সে একটা দিক্ দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্যদিকে আছে তারা কিছুই দেখ্‌চে না এবং সমস্তই ভুল দেখচে বলে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না ; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারিভিতের মধ্যে জোর করে টেনে আন্‌তে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্য্যকে দুর্ব্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলে অবজ্ঞা করে, এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন বলে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্ম্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ, ধারণ করা; প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়—সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্ম্ম-স্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্চে তার অস্থি-কঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময়, প্রাণময়, ভাবময়, গতিভঙ্গী-ময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্য্যকে।

ধর্ম্মসাধনারও চরম পরিচয়, যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিষটি রসের জিনিষ। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায় অনম্রতায়

তার সৌন্দর্য্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্ম্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্য্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিষটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায় এ সে জিনিষ নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে নম্রতা—যে নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সঙ্গীতে মুখরিত হয়, এবং সূর্য্যের কিরণ ঝঙ্কৃত সেতারের সুর-গুলির মত উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে; চারিদিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে—যে নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ

স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সঙ্গীতে পরিণত করে এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্য্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বল্‌তে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা—শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝার নত নয়, সরস প্রাচুর্য্যের দ্বারাই নত; প্রেমে ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে—আনন্দের ধর্ম্মই হচ্চে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাক্‌লে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না—অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়—এমন কি, যে রাজা যথার্থ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে।

রসের ঐশ্বর্য্যে যে লোক ধনী, নম্রতাই তার প্রাচুর্য্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত? যেখানে তিনি সুন্দর; যেখানে রসোবৈ সঃ; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়; সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দ-ভারে দুর্ব্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্চে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড় কথা;—তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য্য অনন্ত এ সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোট; তিনি নত হয়ে

সুন্দর হয়ে ভাবে ভঙ্গীতে হাসিতে গানে রসে গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন এইটেই হচ্চে আমাদের পক্ষে চরম কথা—তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্চে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই যে দুইটি পরিচয়—একটি অটল নিয়মে, আর একটি সুনত্র সৌন্দর্য্যে—এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্য্যটি আছে তাকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে, সে যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্য্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য্য, মিলবে বলেই, ধরা দেবে বলেই সুন্দর। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যেই রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কারিকুরই বড় হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে বেঁধায় না,

মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এই জন্যে কৃচ্ছ্র-সাধনকে যখন কোন ধর্ম্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে যখন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয় তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিল্‌তে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে' আবদ্ধ করে' রাখে; সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে—এই জন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহঙ্কার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম্ম বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখ্‌তে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

. য়িহুদি এই জন্যে আপনার ধর্ম্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমস্তক বন্দী করে রেখেছে ; ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজও ধর্ম্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক্ করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্ম্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারই প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্য্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলি দূরে করচে, কেবলি ভাগ করচে, নিজেকে কেবলি সঙ্কীর্ণ বদ্ধ করে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করচে। হিন্দুর ধর্ম্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের

লোকের পক্ষে সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলি বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বলতে পারিনে। কারণ, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক। অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্য চেষ্টার উপরের জিনিষ। ক্রীতদাস রাজাকে খুন করে সিংহাসনে চড়ে বসলে যেমন হয় স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্ম্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল করে বসে তাহলে সেই রকমের অন্যায় ঘটে। এই জন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক

বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে রাখতে থাকলেও ধর্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্তমান কালে সেই খানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্র পথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায় সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক্ করেছি। আমরা বলেছি মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল গ্রহণে মানুষ ধর্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি—তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে ?

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারই হাতে দিতে চেষ্টা করছি যে জিনিষটা ধর্মের চেয়ে নীচেকার। আমরা

স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারত-বর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা বল্‌চি, তা নাহলে আমরা বড় হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্ম্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে আমাদের জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রয়োজনবুদ্ধিও তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এমন দশা হয়েছে যে, ধর্ম্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে, ধর্ম্ম আমাদের পৃথক থাক্‌তে বল্‌চে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করচে!

কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি যে মিলনের ঘটক নয় সে মিলনের উপর আমি ভরসা রাখ্‌তে পারিনে। ধর্ম্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলি গণ্ডি

আঁকবার এবং বেড়া তোল্‌বার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্ম্মের সিংহদ্বার খোলা থাক্‌লে তবেই ছোট বড় সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব;—নতুবা কেবলমাত্র প্রয়োজনের বা স্বাজাত্যঅভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি খুলে রাখি তবে ধর্ম্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদ পার্থক্য এত বিরোধ-বিচ্ছেদ গল্‌তে পারবে না, মিল্‌তে পারবে না।

ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে ধর্ম্ম যখন আপনার রসের মূর্ত্তি প্রকাশ করে তখনি সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন তা য়িহুদিধর্ম্মের কঠিন শাস্ত্র-বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখ্‌তে পারলে না এবং সেই ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের

শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্ত নিয়ত চেষ্টা করচে, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করচে।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে একটি কঠোর তত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্বকথায় মানুষকে এক করেনি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধ-দেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারতাই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্ত বল সকলেই প্রেমের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে' কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ

করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেমে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে, এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনি সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলেনি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলেনি, আচারের অনুশাসনে মেলেনি।

ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন, তখন সাধককে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং দাম্ভিকতার অহংকার

জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সঙ্কীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাক্‌লে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখ্‌তে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক্ কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুল্‌লে দুর্ব্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক্ আছে সেটি না থাক্‌লে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্চে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেন না দুঃখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়, সেবার মধ্যে কর্ম্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক

হয়েছে সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্ব্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখ স্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট; এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে; বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয়; সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারের কর্ম্ম মলিন করে না, তাকে আরো দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে কর্ত্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয় সে তাঁর অলঙ্কার; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এই জন্যে মানবসমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্ম্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন, এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার

অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না—তাঁরা অনায়াসেই কর্ম্মকে শিরোধার্য্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়—দুঃখে নম্রতা ও কর্ম্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। কর্ম্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন কর্ম্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থ ভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্ব্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয় তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে

দেশদেশান্তরকে উর্বর করে সে চলতে থাকে; তখন নুড়ি পাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় ততই তার সঙ্গীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাৎ কোন্ খানে? না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায় তার ক্ষয় হতে থাকে—এই জন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার নিজেরই গতি, সেই জন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এই জন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান

করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনই মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনি তার ওঠা বসা খাওয়া পরা সকল দিকেই বাঁধাবাধি। তখনি সে সেই সকল নিরর্থক কর্ম্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়।

সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম্ম করে, সর্ব্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার ক'রে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে।

তার সমস্যা হচ্ছে এই যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পথ যাঁরা দেখাতে চান তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। অর্থাৎ গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই

হচ্চে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্যস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এইজন্তে মানুষের ধর্ম্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয় তখনি সংসারে যেখানে যা কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্তার মীমাংসা হয়ে যায়—তখন কর্ম্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্ম্মই তা ক মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

—

গুহাহিত।

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন—"গুহাহিতং-গহ্বরেষ্ঠং"—অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা কিছু প্রকাশিত তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ় যা গভীর তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা' যদি না থাকতো তা হলে সেদিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে বলেই মানুষ এই জগৎকে জন্মলাভ করে কেবল বাইরের জিনিষে সন্তুষ্ট থাকে নি। তাই সে

চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্চে, তাকে কিছুতে থাম্‌তে দিচ্চে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে-বের-করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল? যা কিছু পাচ্চি তার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্চিনে—যা পাচ্চিনে তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল?

পশুদের মনে ত এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারই মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্চে—মুহূর্ত্তকালের জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে, যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজ্‌তে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে পারচে না বলে তাদের মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার, মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না—এমন কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে দেখতে পাচ্চিনে কিন্তু আরও আছে, শোনা যাচ্চে না কিন্তু আরও আছে।

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেলেই তা' প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে এ কিন্তু সে রকম নয়—এ আচ্ছন্ন বলে গুপ্ত নয় এ গভীর বলেই গুপ্ত—সুতরাং একে যখন আমরা জানতে পারি তখনো এ গভীর থাকে।

গোরু উপরের থেকে ঘাস ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটি চিরে সেই ঘাসের মূথা উপড়ে খেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নীচেকার মূথার প্রকৃতিগত কোন প্রভেদ নেই, দুটিই স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই

সমান রকমেই পেট ভরে। কিন্তু মানুষ গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে প্রকাশ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে, সাদৃশ্য নেই। তা' খনির ভিতরকার খনিজের মত তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিষ নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চেয়ে বেশি মূল্যবান্ রত্ন বলেই জানে।

তার মানে আর কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে, তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এই জন্যই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এই জন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এইটুকু মাত্র দেখেই মাটীর দিকে চোখ ফেরায়নি—এই জন্যে কোন্ সুদূর অতীত কালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরু-প্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে

নিশীথরাত্রের আকাশ-পৃষ্ঠায় জ্যোতিষ-রহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ নিদ্রাহীন নেত্রে যাপন করেছে;— তাদের যে বেষয়িক চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারো সেদিকে তাকাবার প্রয়োজন মাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায় নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না।

এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ যে কেবল সত্যকেই উদ্‌ঘাটন করেছে তা বলতে পারিনে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এক-কে আর বলে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই কিন্তু তাইবলে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে ত একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি

অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে যে সত্য বলে গ্রহণ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূত প্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্ত্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই কিন্তু তাই-নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখিনে। গভীরজলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগ্‌লি ওঠে তার থেকেই জাল ফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেলচে তার থেকে এ পর্য্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারিনে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা এইটেই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ;—আফ্রিকার বন্যবর্ব্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয়

পাই তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্ত্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না ক'রে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য—এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্তে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, একে জয়যুক্ত করবার জন্তে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মান্‌তে চায় না। এখানে সমুদ্র পর্ব্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না, বারম্বার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না—এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করতে পারে।

মানুষ যে দ্বিজ; তার জন্মক্ষেত্র দুই

জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাণ্ড, আর এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করচে, সে জন্যে তাকে চতুর্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয়। তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয় কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি—এমন কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড় করে তোলে তখন সবদিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে গোপনের দিকে গভীরতার দিকে মানুষের

চেষ্টাকে যখন টানে তখনই মানুষ বড় হয়ে ওঠে, ভূমার দিকে অগ্রসর হয়, তখনি মানুষের চিত্ত সর্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম যা প্রত্যক্ষ তাতে মানুষের সমস্ত চেষ্টাকে উদ্যম দিতে পারে না, এই জন্য কেবলমাত্র সেইদিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত, তাঁর সঙ্গেই কারবার করে—সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক, সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না—তাকে মাপ করে ওজন করে দেখাবার কোনো উপায়ই নেই—তাকে যদি কোনো

স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি অস্বীকার করে বসে, যদি বলে, কি তুমি পেলে একবার দেখি—তাহলে বিষম সঙ্কটে পড়্‌তে হয়। এমন কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আবদার চলে না। আমরা দেখাতে পারি ভারী জিনিষ হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারিনে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে আমি সমুদ্র দেখ্‌ব, আমি হিমালয় পর্ব্বত দেখ্‌ব তবে তাকে এ কথা বল্‌তে হয় না যে, আগে তোমার চোখ দুটোকে বড় বড় করে তোলো তবে তোমাকে পর্ব্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব—কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বল্‌তেই হয় একটু রোসো; গোড়া থেকে সুরু কর্‌তে হবে; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত কর তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ

মেল্‌লেই চল্‌বে না, কান খুল্‌লেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে হবে। মূঢ় যদি বলে, না, আমি সাধনা কর্‌তে রাজি নই, আমাকে তুমি এ সমস্তই চোখে-দেখা কানে-শোনার মত সহজ করে দাও, তবে তাকে, হয়, মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয়, তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে গণ্য কর্‌তে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে গুহা-হিতং গহ্বরেষ্ঠং বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখা-শোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেক সময় খুঁজে থাকি—কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজে করে দিচ্ছি; বলে সেই বিভু "নিহিতং গুহায়াং" তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন খুসি

এক রকম করে দাঁড় করিয়ে দেন তাহলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন। এ রকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বলবার কথা যে মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর বলেই তাঁকে চায়—সেই গভীর আনন্দ আর কিছুতে মেটাতে পারে না বলেই তাঁকে চায়—চোখে-দেখাকানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে—তার জন্তে আমাদের বাইরের মানুষটা ত দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে সমস্ত কিছু চায় না বলেই একাগ্র মনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা কর, এবং যখন তাঁকে পাবে—তোমার "গুহাশয়" রূপেই তাঁকে পাবে ; অন্তরূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না ; সে কেবল বিষয়কেই অন্ত একটা

নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্ছে তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না—তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা, সর্ব্বত্রই তিনি গুহাহিতং, কি সাহিত্যে, কি ইতিহাসে, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—এই কথাটি যে মানুষ বলতে পেরেছে এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এই জন্তেই সে গভীরকে চায়—তবু যদি তুমি বল আমার হাতের তেলোর 'পরে সহজকে এনে দাও তবে তুমি আর কিছুকে চাচ্চ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা

অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনছি, অনায়াসে বুঝছি তার মত কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতিপ্রত্যক্ষগোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজ দেখাশোনার আবরণ ভেদ করেই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা কিছু পাওয়ার মত পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ করে তবে কর্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধাতৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মত সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এই জন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে—বারবার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে

পারচে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে; ভালবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করচে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য্য হোক্ এ'কে সে কোনো-মতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না; তাকে বলতেই হবে যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্যসাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন—কেন না, তার পক্ষে নায়ে সুখমস্তি।

জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে মানুষের পক্ষে সর্ব্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে

সর্ব্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম করে' গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে থাকে তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা করে আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে এ কথা বলে না, টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে।—টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মত সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উল্‌টো কথা বল্‌তে যাব! কেন বল্‌ব তাঁকে আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই! কেন বল্‌ব আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ করে তাঁকে হাতে হাতে চোখে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব!

না, কখনো তা আমরা চাইনে! তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই,

জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্যান্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠচে। হে গূঢ়! তুমি গূঢ়তম বলেই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্ম্মকে গভীর হতে গভীরতরে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্চে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্চে, তার বন্ধন আল্‌গা করে দিচ্চে, তার জীবন মরণের তুচ্ছতা দূর করচে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম সুর

আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসচে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্ত তোমার ঐ অনির্ব্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্চে। মানব চিত্তের এই আকাজ্ঞার আবেগ এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে চলেছ। হে গুহাহিত, তোমার গোপনতার শেষ নেই বলেই জগতের যত প্রেমিক যত সাধক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; এমন মধুর করে তাঁরা দুঃখকে অলঙ্কার করে পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে বরণ করেছেন্। তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটচ্ছে—তারা, বল তেজ সম্পদ সমস্ত

হারিয়েছে—তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলি ছোট ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলি সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্ব্বল কল্পনা করে তোমাকে যারা সুলভ করতে চেয়েছে তারা মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ গৌরবকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু ;—প্রগাঢ় গম্ভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।" তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো-করে না দেখি। তোমাদের ঐ পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে ততই তার কাব্য সঙ্গীত ললিতকলা অনির্ব্বচনীয় রসের আভাসে

রহস্যময় হয়ে উঠ্‌চে, ততই তার জ্ঞান, সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করেছে, তার কর্ম্ম, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করচে—তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠ্‌চে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চল্‌ব—আমার সমস্ত যাত্রাসঙ্গীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্য্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে,—পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে কোনো ছোটকে কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে—আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে না দেয়।

২৩শে চৈত্র, ১৩১৬ সাল।

দুর্লভ

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

পারিনে যখন বলি তার অর্থ এই, সহজে পারিনে; যেমন করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করচি কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্চেনা, ঈশ্বরকে তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারিনে।

কিন্তু গোড়া থেকেই মানুষের পক্ষে কিছুই সহজ নয়; ইন্দ্রিয় বোধ থেকে আরম্ভ করে ধর্ম্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষকে এত সুদূরে টেনে নিয়ে যেতে হয় যে মানুষ হয়ে ওঠা সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার বিষয়। যেখানে সে বল্‌বে "আমি পারিনে" সেইখানেই তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি ক্ষয় হয়ে

যাবে, তার দুর্গতি আরম্ভ হবে; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশুশাবককে দাঁড়াতে এবং চলতে শিখতে হয়নি। মানুষকে অনেকদিন ধরে বারবার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে; আমি পারিনে বলে সে নিষ্কৃতি পায়নি। মাঝে মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানবশিশুকে হরণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই সব মানুষ জন্তুদের মত হাতে পায়ে হাঁটে। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেই জন্য শিশুদের পক্ষে হামাগুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই খাড়া হয়ে দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ। এই উপায়ে যখনি সে আপনার দুই হাতকে মুক্তিদান করতে পেরেছে তখনি পৃথিবীর উপরে সে কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে।

কিন্তু শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে দুই পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবন-যাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার সহজ করে নিতে হয়েছে; যে মাধ্যাকর্ষণ তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে টানচে, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিক্ষা।

বহু চেষ্টায় এই সোজা হয়ে চলা যখন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল, যখন সে আকাশের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুলতে পারল তখন জ্যোতিষ্কবিরাজিত বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই যেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষকে কষ্ট করে শিখ্‌তে হয়েছে, সমাজের মধ্যে চলাও তাকে বহুকষ্টে শিখ্‌তে হয়েছে। খাওয়া পরা, শোওয়া বসা, চলা বলা, এমন কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করতে

হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়ম সংযম মান্‌লে তবে চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান, তার প্রয়োজন ও আনন্দের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা না হয় ততদিন তাকে পদে পদে দুঃখ ও অপমান স্বীকার করতে হয়—ততদিন তার যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অধিকার লাভের চেষ্টাতেও মানুষকে অল্প ক্লেশ পেতে হয় না। যা চোখে দেখচি কানে শুন্‌চি তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মানুষের চলে না। এই জন্যেই বিদ্যালয় বলে কত বড় একটা প্রকাণ্ড বোঝা মানুষের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়—তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা। জীবনের প্রথম কুড়ি পঁচিশ বছর মানুষকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয়—এবং যাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এমনি সকল দিকেই দেখতে পাই মানুষ মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় তপস্যা করচে। আহারের জন্তে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে চাষ করাও তার তপস্যা, আর নক্ষত্রলোকের রহস্য ভেদ করবার জন্তে আকাশে দূরবীন তুলে জেগে থাকাও তার তপস্যা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল, জ্ঞানের রাজ্যেই বল, সামাজিকতার রাজ্যেই বল সর্ব্বত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্তে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে, পারিনে, তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না, তারই মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে—সহজের প্রকাণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সর্ব্বত্রই উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই সহজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে অনাবশুক ছঃসাধ্যসাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর

কোনো প্রাণীর মধ্যেই এই অদ্ভুত জিনিষটা নেই। যেটা সহজ, .যেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখ্‌লে অন্য কোনো প্রাণী সুখ বোধ করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা যে লড়াই করে সে কেবল প্রয়োজন সাধনের জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, অর্থাৎ দায়ে পড়ে; সে লড়াই গায়ে পড়ে দুঃসাধ্য সাধনের জন্যে নয়। কিন্তু মানুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পন্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এই জন্যেই যে ব্যায়ামকৌশলে কোনো প্রয়োজনই নেই সেটা দেখা মানুষের একটা আমোদের অঙ্গ। যখন শুন্‌তে পাই বারম্বার পরাস্ত হয়েও মানুষ উত্তরমেরুর তুষার-মরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে আপনার জয়পতাকা পুঁতে এসেছে তখন এই কার্য্যের লাভ সম্বন্ধে কোনো হিসাব না করেও আমাদের ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব পুলক অনুভব করে। মানুষের প্রায় প্রত্যেক খেলার মধ্যেই শরীর বা মনের

একটা কিছু কষ্টের হেতু আছে—এমন একটা কিছু আছে যা সহজ নয় বলেই মানুষের পক্ষে সুখকর।

যখন কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে "পারিনে" একথাটা বলতে দেওয়া হয়নি তখন ব্রহ্মের মধ্যে মানুষ সহজ হবে সত্য হবে, এ সম্বন্ধেও "পারিনে" বলা তার চলবে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই সে নিতান্ত সামান্য চেষ্টা করেই যদি ফল না পায় তবেই একথা বলা তার সাজবে না যে আমার দ্বারা একেবারে সাধ্য নয়।

যতই সহজ ও যতই আরামের হোক্ তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পশুর মত চলে বেড়াব না মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদ্ ছিল বলেই মানুষ বেদনা বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে—এবং সেই আকাশে

মাথা তুলেছে বলে পৃথিবীর অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়নি, বরঞ্চ পশুর চেয়ে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনি আমাদের মনের অন্তরতম দেশে আর একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে, আমরা কেবলি সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মত ধূলা ঘ্রাণ করে করেই বেড়াতে পারব না—অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব না বরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তখন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জন্তু যেমন চার পায়ে চলে বলে হাতের ব্যবহার পায় না তেমনি বিষয়ীলোক সংসারে

চার পায়ে চলে বলে কেবল চলে মাত্র, সে ভাল করে কিছুই দিতে পারে না এবং নিতে পারেনা। কিন্তু যাঁরা সাধনার জোরে ব্রহ্মের দিকে মাথা তুলে চল্‌তে শিখেচেন, তাঁদের হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়—তাঁদের দুই হাত যুক্ত হয়েছে—তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে—তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্ত্তা, তাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা।

যে সৃষ্টিকর্ত্তা সে আপনাকে সর্জ্জন করে; আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড় হয়ে উঠেছে। যে পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। এই সৃষ্টিশক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল

ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে পরিমাণে স্বার্থবর্জ্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা, তার কর্ম্ম, সৃষ্ট হয়ে উঠে।

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিকলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্ব্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে "পারিনে" বলে চলবে না— চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার "মহতী বিনষ্টিঃ"।

যে ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই নিজেকে উৎসর্জ্জন করচে, যিনি "আত্মদা", আমি জলে স্থলে আকাশে সুখে দুঃখে সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুল্‌তে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্চে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্চে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চল্‌তে শেখা। অনেকবার টল্‌তে হবে, বারবার পড়্‌তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না, তবে বুঝি পারব না। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা অন্তরের মধ্যে এইদিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে—এই জন্তে মানুষ দুঃসাধ্যতাকে ভয় করে না তাকে বরণ করে নেয়—এই জন্তেই মানুষ এত বড় একটা আশ্চর্য্য কথা বলে জগতের অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।

জন্মোৎসব*

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ—এতে আমার অনেক দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগেনি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড় করে আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

বস্তুত নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড় নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

* বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত।

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন উৎসব তাঁদেরই। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ-উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড় করে উপলব্ধি করে-ছিলেন তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে—সংসারে তার আবির্ভাব যে পরমরহস্যময় এবং সে যে চিরদিন এখানে থাকবে না সে কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে—মনে হয় তার ক্ষতিও নেই বৃদ্ধিও নেই, সে আছে ত আছেই—তার মধ্যে অন্তরের

প্রকাশ আর আমরা দেখ্‌তে পাইনে। তখন যদি আমরা উৎসব করি সে বাঁধা প্রথার উৎসব—সে একরকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না—তখন সে যেন আমাদের কাছে এক রকম ফুরিয়ে আসে। সে রকম অবস্থায় তাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চল্‌তে পারে কিন্তু উৎসব চল্‌তে পারে না—কারণ, উৎসব জিনিষটাই হচ্চে নবীনতার উপলব্ধি—তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্চে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেই খানেই তার প্রকাশ।

আজ আমি উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেই দিনের কথা মনে পড়চে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জলতার উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে আজ তোমার জন্ম-দিন! আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ সেই রকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত—নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহদৃষ্টির পথ

বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠ্‌ত। বস্তুত জীবন তখন আমার-সাম্‌নেই— পিছনে তার অস্তি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধুয়াটির মত অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্ব্বচনীয়ের তান লাগাতে থাকৃত।

পথ তখন নির্দ্দিষ্ট হয় নি। নানাদিকে তার শাখাপ্রশাখা! কোন্‌দিক্ দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কি পাব তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দ্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ত।

ঝরনা যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতি পরিবর্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন, তার পথ সুনির্দিষ্ট হয় তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারও জীবনের ধারা যখন ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে, তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথেই স্ফীত হয়ে বইতে লাগল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সঙ্কুচিত হয়ে চলতে থাকল। তখন নিজের জীবনকে বারবার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এই জন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর কোনো নূতন আশার সুরে

বাজ্‌তে থাক্‌ল না। সেইজন্তে জন্মদিনের সঙ্গীতটি যখন নিজের ও অন্তের কাছে বন্ধ হয়ে এল তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর কারো কাছে এর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

এমন সময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম ত আমার অর্দ্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে যে কবেকার পুরাণো কথা তার আর ঠিক নেই—মৃত্যু-দিনের মূর্ত্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে—এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার?

এমন সময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল—এবং সেই কথাটাই তোমাদের সাম্‌নে আমি বল্‌তে ইচ্ছা করি।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে? জগতে আমরা অনেক জিনিষকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই; কিন্তু অতি অল্প জিনিষকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক; তারা আমাদের চারিদিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাইনি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বলছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্চে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্ত্তেই আপনার লোককে পায়,—পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন

চিরন্তন। অল্পকাল পূর্ব্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না—না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনাগোনার, কোনো প্রয়োজন হয়নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মত আপন করে পাওয়া যায় তখনো এই সাজসজ্জা এই গীতবাদ্য। "তুমি আমার আপন" এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলতে পারে না—এতে সৌন্দর্য্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল তোমাকে আমরা

পেয়েছি—সেইদিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায় যে, তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব করচ তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোন গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয় তা বলতে পারিনে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয় —তেমনি মানুষকে বারবার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন্‌ রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম, কে জানে! কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতনক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মত আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও এ কত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ

বেঁধে গেছে! সেই জন্যেই আজকের এই আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাত লোক ছিল।

সেই জন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকলে তোমাদের আনন্দ উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করচি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি এ আমার সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্ছে কেন্দ্রবর্ত্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়—এখানে সে অনেকের অন্তর্বর্ত্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্চি কেন্দ্র, অন্য সমস্ত তার পরিধি, মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্বর্ত্তী; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালমন্দেই তার ভালমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারিনে; মায়ের কোলেই ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক্ থেকে এ যেমন, অন্তরের দিক্ থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেই রকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারিনে। ভ্রূণের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠিনে। তখন আমরা চল্‌তে চাই, কারণ, চারিদিকে চলার ক্ষেত্র অবারিত—কিন্তু চল্‌তে

পারিনে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্চে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মত চলতে গিয়ে বারবার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার এই সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গললোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে ঘুমিয়েই কাটাচ্চে, তখনো যেমন জানা যায় সে এই চলা ফেরা, জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে বয়স্কদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকে না তেমনি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের অক্ষমতা ও অকৃতার্থতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়েছে সে কথা একরকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন কি জড়তায়

সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতর বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে তখন সে দ্বিধাহীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে তখন অনেক দুঃখস্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

[illegible] ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ, এলোকের জীবনই হচ্চে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকে না, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে, তার অন্তরাত্মা যে ডালকে আশ্রয় করে তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে শ্রেয়কে আশ্রয় করে' সে অহঙ্কারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অহঙ্কার গোপনে সেই

শ্রেয়কেই আশ্রয় করে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি করে প্রথম অবস্থায় বিরোধ অসামঞ্জস্যের বিষম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি এখানে আমার পূর্ব্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এই জন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে আলো একটুখানি দেখা দিয়েছিল সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু একথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মত আশ্রয় করেছিমাত্র বয়স্কের মত

এ'কে আমি অধিকার করতে পারিনি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসঙ্গতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ—একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ এবং সেই জন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ একথা যদি সত্য হয় তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এই সঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে, যেলোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এলোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জানতে পারতে না। এই

আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝরণাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানা সুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে একটি বৃহৎ ধারায় সম্মিলিত হয়ে নদী-জন্মলাভ করে —তোমাদের ছোট ছোট জীবনের ধারাগুলি তেম্‌নি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে—তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জান্‌তে—সেই জানার সঙ্কীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে পাচ্চ—এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ এই হচ্চে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্ত সম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোন সঙ্কীর্ণ ব্যবধান নেই;

এখানে তিনিই পিতা হয়ে প্রভু হয়ে আছেন, "য একঃ" যিনি এক, "অবর্ণঃ," যাঁর জাতি নেই, "বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি," যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজন সকল বিধান করচেন,—"বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ," বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি, "সদেবঃ" সেই দেবতা। "সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গল বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন্। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয়বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

২৫শে বৈশাখ ১৩১৭

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে, জগতে আর যত কিছু কথা আছে সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিকমত তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে তবে সে এই শ্রাবণের ধারা-পতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার

তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বারবার তাকে ধ্বনিত করে তুলচে—শিশু যায় নূতন-শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে, সেই রকম—তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনচে—আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে—সেও কিছু একটা বলতে চাচ্চে।—ঐ রকম খুব বড় করেই বলতে চায়, ঐ রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়—কিন্তু সে ত কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজচে। জলের কল্লোলে, বনের মর্ম্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা কিছু কথা

সে ত স্পষ্ট কথায় নয়—সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এই জন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্ব্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিষটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ; আর, গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেই জন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এই জন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিষ করে তোলে, তার বেদনা প্রভাত-সন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রং মিলিয়ে দেয়, জগতের

বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করচে। প্রকৃতি হতে রং এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলচে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলচে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিষগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্কোচ এবং নিত্য-ব্যবহারের মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস, নবীন এবং মহৎ মূর্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘন বর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্চে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করচে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলচি আমার কথা আজ থাক্। সংসারের কাজ কর্ম্মের সীমাকে, মনুষ্য-লোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশ-ভরা শ্রাবণের ধারা-বর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নেও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড় বিচিত্র। বাহিরে তার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর এক মূর্ত্তি।

একটা দৃষ্টান্ত দেখ—গাছের ফুল। তাকে

দেখতে যতই সৌখীন হোক্ সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজ সজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হোক্ তাকে ফল ফলাতেই হবে, নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিঁকবে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এই জন্তেই তার রং, এই জন্তেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণুপাতে যেমনি তার পুষ্পজন্ম সফলতা লাভের উপক্রম করে অমনি সে আপনার রঙীন্ পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্ম্মমভাবে বিসর্জ্জন দেয়; তার সৌখীনতার সময় মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহিরবাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে, হন্‌হন্ করে ছুটে চলেছে,—যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই, সেখানে কোনো কৈফিয়ৎ কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে

ছাপ পড়ে যায় "নামঞ্জুর," তখনি বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ঐ ফুলটিকে যে দেখচ, অত্যন্ত বাবুর মত গায়ে গন্ধ মেখে রঙীন পোষাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়—বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্তিমান। এই একই জিনিষ বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, তুমি ভুল বুঝচ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য

কার কর্ম—তার সঙ্গে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের যে অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ সে তোমার নিজের পাতানো।

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, কিছুমাত্র ভুল বুঝিনি। ঐ ফুলটি কাজের পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্য্যের পরিচয়পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে আঘাত করে—একদিকে আসে বন্দীর মত, আর একদিকে আসে মুক্তস্বরূপে—এর একটা পরিচয়ই যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয় একথা কেমন করে মানব? ঐ ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্য্য-কারণ-সূত্রে ফুটে উঠেছে একথাটাও সত্য কিন্তু সে ত বাহিরের সত্য, আর অন্তরের সত্য হচ্চে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

ফুল মধুকরকে বলে তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি—

আবার মানুষের মনকে বলে আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আন্‌ব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি। মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে' কিছুমাত্র ঠকেনি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস করে' তাকে ধরা দেয় তখন দেখ্‌তে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলেনি।

ফুল যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ করচে তা নয়—মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ, তা সে বরাবর করে আস্‌চে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কি? প্রকৃতির দরজায় যে ফুলকে যথাঋতুতে যথা-সময়ে মজুরের মত হাজ্‌রি দিতে হয় আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজদূতের মত উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদ্‌ছিলেন তখন একদিন যে দূত কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল সে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে

করে এনেছিল—এই আংটি দেখেই সীতা তখনি বুঝতে পেরেছিলেন এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে—তখনই তিনি বুঝলেন রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কার রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি—রাক্ষস আমাদের কেবলি বলচে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা কর।

কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে, আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্ন-তার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে একমুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি

তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবে না।

যদি তখন আমরা জেগে থাকি ত তাকে বলি তুমি যে তাঁর দূত তা আমরা জানব কি করে? সে বলে, এই দেখ আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রং এর কেমন শোভা!

তাইত বটে। এ যে তাঁরি আংটি, মিলনের আংটি। আর সমস্ত ভুলিয়ে তখনি সেই আনন্দময়ের আনন্দ স্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনি আমরা বুঝতে পারি এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয় —এর বাইরে আমার মুক্তি আছে—সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবল-মাত্র রং, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধা-

নিবৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন—মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য্য, তাই বিনাপ্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙীন কালীতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হোক্ না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানাঘরের কলশব্দ সঙ্গীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্য্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্ ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড় আশ্চর্য্য ঠেকে —একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির—একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং

আনন্দের—বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি—একই সময়ে এক-দিকে তার কর্ম্ম আর একদিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই যে এই মুহূর্ত্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে এই অন্ধকার সভার আমাদের কাছে এ কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাচ্ছে, কেবল লীলার আয়োজন করছে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে

উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলি করুণ্ গান জেগে উঠ্‌চে :—

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি

হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্ত্তাই সে জানাচ্চে, ওরে, তুই যে বিরহিনী—তুই বেঁচে আছিস্ কি করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাট্‌চে ?

সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্চে না।

আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন করে কাটাচ্চি এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেন না বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া

যেমন আগুন জলার আরম্ভ বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে? ঐ যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করচে, তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, যারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর একজন বাঁধা থেকে দিন রাত্রি কেবল বোবার মত কাজ করে যাচ্চে—তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনি দেখতে পাই এ যে বিরহের বেদনা-গান, এ যে মিলনের আহ্বান-সঙ্গীত। যে সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না সে সব খবরকে এরাই ত চুপি চুপি বলে যায়—এবং মানুষ কবি সেই সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে,—

"ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।"

আজ কেবলি মনে হচ্চে এই যে বর্ষা, এ ত এক সন্ধ্যার বর্ষা নয় এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্চে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বল্‌চে—"কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।" কিন্তু তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়;—এই অন্ধকারের এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আস্‌চে, এমন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য —যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুল্‌চে তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আস্‌চে।

বিরহ সন্ধ্যায় অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে, "কেমন করে তোর দিন-রাত্রি কাটবে"—তাহলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্য্যন্ত বাঁচত না ;—কিন্তু শুধু কেমন করে কাটবে নয় ত—"কেমন করে কাটবে হরি বিনে দিনরাতিয়া"—সেই জন্তে "হরি বিনে" কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ ! চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে—তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে সে আছে—বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে—সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া ! এই জীবন-ব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ-সুরের বাঁশী বাজাচ্ছেন সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া !

দ্বিধা

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্চে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যতকিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দীক্ষা সাহিত্য শিল্প সমস্তই হচ্চে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই

হচ্ছে উদ্ভিদের মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাক-স্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই দুটোকে এক করবার জন্তে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্ব্বদাই জাগিয়ে রেখেছে; গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে—ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্য-সাধনের জন্তে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার আর সীমা নেই; উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই, অথবা যেখানে তার মিলনসাধনের জন্তে বাইরের উপায় কাজ করে সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক্ এবং পরমার্থের দিক্, বন্ধনের দিক্ এবং মুক্তির

দিক্, সীমার দিক্ এবং অনন্তের দিক্—এই দুইকে মিলিয়ে চল্‌তে হবে মানুষকে।

যতদিন ভাল করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান পতনের দুঃখ সে বড় বিষম দুঃখ। যে ধর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘট্‌তে পারে সেই ধর্ম্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা;—একথা তার বলবার জো নেই যে এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চল্‌ব। এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয়;—সেই দুর্গতি যে কি নিদারুণ পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই— তারা কেবলমাত্র পশু। তারা কেবলমাত্র শরীর ধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চল্‌বে এতে তাদের কোনো ধিকার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসঙ্কোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সঙ্কোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ আড়ালের মধ্যে দিয়েই চল্‌তে হয়—তার আহার বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত—নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন, এমন কি, নিজের নিত্য-সহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ মানুষ যে পশু এবং মানুষ দুইই। একদিকে সে আপনার আর একদিকে সে বিশ্বের। একদিকে তার সুখ, আর একদিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক।

যদি জানতে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে তাহলেই বুঝতে পারি এ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই সকল আপাত-অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকারবাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি, বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না—উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয় তবে সেই সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবারবেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন কি, জীবনে আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়—যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর জ্ঞান ও মহত্তর চেষ্টায়

দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে, যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জন করতে প্রবৃত্ত করে—তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই —তার থেকে নিক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে—মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিক্রান্ত হওয়াই হচ্চে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্য-সাধন। কারণ স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাকলেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই তখনই আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনই আমরা আপনাকে পাই বলেই অন্য সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানেনা বলেই অন্য মাকে জানেনা—যখনি মাতার মধ্য হতে মুক্ত

হয়ে সে নিজেকে জানে তখনি সে তাকে জানে।

সেই জন্তে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলি টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুলবে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেলবে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই— মা মা হিংসীঃ—আমাকে আঘাত কোরোনা, আমাকে আর আঘাত কোরোনা। আমি এমন করে কেবলি দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচিনে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত—এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না—পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না,—মানুষ পশুদের মত অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু, মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ, বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই তো মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না—'বিশ্বানি দেব সবিত দু'রিতানি পরাসুব'—হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও! এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজন সাধনের প্রার্থনা নয়—মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে আমাকে পাপ হতে মুক্ত কর। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না—পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারচিনে—হে অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারচে না

—তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারচিনে।

'যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব'—যা ভাল তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা। কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব—ভাল যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব, এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা দুঃখের প্রার্থনা—নাড়ি ছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর কেউ করতে পারেনা।

পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু —যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা। তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা বলে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত

করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তাহলেই যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়—আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌঁছতে পারি। সেখানে যে পৌঁচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায়;—সেখানে কোনো অহঙ্কার টিঁকতেই পারে না—ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়;—মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহঙ্কারের একান্ত বিসর্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার?

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার—যিনি সুখের আকর

তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার যিনি চরম মঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা বলে নমস্কার করচে তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা গেছে পিতরৌ বল্‌তে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন—তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর-সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এই জন্যে তাকে দেখা শোনা তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস

তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্বপ্রকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সঙ্কীর্ণ পরিধির কেন্দ্রস্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ করে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এই জন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি এক মাত্র হত নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত তাহলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়—তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোট হয়ে না থেকে বড় হয়ে ওঠবার যে দুঃখ তা তাকে না

মিলে চলে না। বড় হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে যে সত্য হবে, তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান, ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তিলাভ করবে—এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই আমি সুখী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্যামলতায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়—যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাস অসম্ভব হত না। ফলে শস্যে আমাদের রসনার তৃপ্তি হয়—যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ; শরীর চালনা

করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আনন্দ। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য এবং রসের যোগ আছে।

তাই দেখ্‌তে পাই বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র-ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত রয়েছে, যে, জগৎ চল্‌বে, জীবন চল্‌বে এবং সেই সঙ্গে আমি পদে পদে খুসি হতে থাকব। নক্ষত্রলোকের যে সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভূত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই সুদূরবর্ত্তী হোক্ না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেই জন্য অতবড় অচিন্তনীয় বিরাট্ কাণ্ডও প্রয়োজনবিহীন গৃহসজ্জার মত হয়ে উঠে' আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আকাশমণ্ডপটিকে চুম্‌কির কাজে খচিত করে তুলেছে।

এমনি পদে পদে দেখ্‌তে পাচ্ছি জগতের রাজা আমাকে খুসি করবার জন্ত তাঁর বহুলক্ষ যোজনান্তরেরও অনুচর পরিচরদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভুল্‌তে পারে না। এ জগতে আমার মূল্য সামান্ত নয়।

কিন্তু সুখের আয়োজনের মধ্যেই যখন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই—তখন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে—বলে, যে, তোমাকে বদ্ধ হতে দেব না; এই সমস্ত সুখের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে মুক্ত হয়ে তোমাকে থাক্‌তে হবে তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেতনভাবে তার মাকে পায় তেমনি এই সমস্ত সুখের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন মঙ্গললোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে তখনই সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যখনি

আসক্তির পথে যাবে তখনই সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে—বস্তুকে যখনি চোখের উপরে টেনে আনবে তখনি তাকে আর দেখতে পাবে না, তখনি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের পিতা সুখের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে—এবং সেই যোগের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগ সাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গল বোধই মানুষকে কিছুতেই সুখের মধ্যে স্থির থাকতে দিচ্ছে না—এই মঙ্গল বোধই পাপের বেদনায় মানুষকে এই কান্না কাঁদাচ্ছে—মা মা হিংসীঃ, বিশ্বানি দেব সবিত দু'রিতানি পরাসুব, যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। সমস্ত খাওয়া পরার কান্না ছাড়িয়ে এই কান্না উঠেছে—আমাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে আর আঘাত কোরো না, আমাকে পাপ থেকে মুক্ত কর; আমাকে

সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও।

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করচে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার, আর যেই কল্যাণকর যে তাঁকেও নমস্কার—একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলার মধ্যে চক্ষে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখ্‌তে হবে - তাই বলি, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ—সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার—মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করচেন পালন করচেন তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করচেন তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে

—তখন নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ নেই বিরোধ নেই—তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর—তখন পিতা এবং মাতা একই—তখন এক-মাত্র পিতা ;—এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত ঊর্দ্ধগামী একাগ্র এই নমস্কার—অনুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মত দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

শান্তিনিকেতন

ভক্তবাণী

(দ্বিতীয় ভাগ)

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
বোলপুর
১৯০৯

মূল্য ।০ আনা।

প্রকাশক—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ.

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস

কলিকাতা

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্

এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান্ প্রেস হইতে শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা

মুদ্রিত

শান্তিনিকেতন

ভক্তবাণী

(১)

হে অন্তরাত্মন্, আমি এমন স্পষ্টভাবে তোমার জ্যোতির্ম্ময়রূপ আর কোথায় দেখিব যেমন আমার নিজের আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশমধ্যে দেখিতে পাই? সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, স্বর্গতত্ত্ব, নীতি, সত্য, সৌন্দর্য্যের মিলন, সর্ব্ব প্রকার রস রূপ গুণ এসব বিবিধ মহাভাব ও মহাপ্রতিভা একাকার করিয়া হে সর্ব্বময়, তুমি মানুষের আত্মার মধ্যে বসতি করিতেছ।

সেখানে সগুণ নির্গুণের মিলন, জড় চৈতন্যের মিলন, সান্ত ও অনন্তের মিলন পাই। তুমি অন্তরে দীপ্যমান, সেই আভ্যন্তরিক

রশ্মি হইতেই বাহ্য প্রকৃতির শ্রী, সৃষ্টির মহান্ আবির্ভাব ও উদ্দেশ্য,—তুমি যার নিজ হৃদয়ে প্রকাশিত নাই তার বিচারে তুমি কোথাও নাই। তার নিকট সৃষ্টি নিরীশ্বর। আসল কথা এই, বাহিরে সারবস্তু নাই, মানুষ মহামায়া ও ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন, তাই অসারকে সার মনে করে। যাহা ইন্দ্রিয়গোচর, তাহা কেবল দৃশ্যমান চঞ্চল লীলা, তাহা তোমার অন্তর্নিবাসের ছায়ামাত্র। তুমিই মূলাধার, সর্ব্বময়, সর্ব্বেসর্ব্বা। তোমার সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ হয়, কোথায় থাকে প্রকৃতির সারতত্ত্ব, কোথায় থাকে মানুষের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ? তখন সংসার মোহান্ধকারময় বন্দীগৃহ, আর কিছুই নহে। তখন আমি অন্ধকারের সন্তান, প্রবৃত্তির ক্রীড়াবস্তু, মোহ মায়া অনীতির দাস, মৃত্যুর অধিকৃত বলিদান, জনাকীর্ণ জগতে আমি একাকী! নিরীশ্বর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে একবারও জয় লাভ করিতে পারি

না। যখন আবার তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হই, তখন অন্তর্দৃষ্টিতে হৃদয়ধামে দেখি এ জগতে তুমি দিব্যমূর্ত্তি, তখন মানুষ হইয়া যাহা কিছু দেখিবার তাহা অবাক্ হইয়া দেখি, দেহধারণে ইহলোকতত্ত্ব, বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, যাহা কিছু প্রাপ্য তখন তাহা পাই। তোমার সঙ্গে অন্তরে মিলন হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুকূল হইয়া উঠে! তোমার সঙ্গে মিলন হইলে আর কাহাকেও মনে থাকে না, আর কাহাকেও ভয় থাকে না, আর কাহাকেও আবশ্যক থাকে না, গুরু, আচার্য্য, মধ্যবর্ত্তী, মহাজন সকলেই তোমামধ্যে অদৃশ্য হন।

প্রতাপচন্দ্র।

---

(২)

স্তনের দুগ্ধ যদি কোন তীর্থে থাকৃত, তাহ'লে আমি বাঁচতাম না ; তিনি তা' করেন নাই। যাঁর গর্ভে আমার জন্ম, যে রক্তে আমার শরীর, তিনি সেই মায়ের রক্ত দুধ করে' মায়েরই স্তনে রেখেছেন। আমার শরীরে শরীরে রক্ত চল্‌ছে, জল বাতাস প্রভৃতির সঙ্গে আমার কতই নিকট সম্বন্ধ! এ যিনি করেছেন, তিনি কখনই আমার ব্যাকুল প্রাণকে একাকী বিনষ্ট হ'তে দেবেন না। কোন গ্রহে, সূর্য্যে বা নক্ষত্রে, কোন পর্ব্বতে, কোন তীর্থে বা মানুষে, কোথাও রাখেন নাই—অতি নিকটে—অতি নিকটে—খুব কাছে আমার নিজের প্রাণের মধ্যে সেই ধন রাখিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রহিয়াছেন। সত্য-ক্ষুধা হউক, সত্য-পিপাসা হউক, অম্‌নি পাব। পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলি, বুকে হাত দিয়ে সকলেই আপনাকে প্রশ্ন কর দেখি,

আমিও করি তোমরাও কর—চাই কি ? তাঁকে কি চাই ? বাস্তবিক যদি চাই তবে পাই—যখনই চাই তখনই পাই, যা চাই তা দেন। যেমন করে' চাই তেমনি করে' পাই। পাব না কেন ? আমাকে পাগল করে' রাখ্‌তে তিনি পারেন না, আমার যে আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু আমি চাই না, গভীরভাবে আত্মপরীক্ষা কর্‌লে দেখ্‌তে পাই যে আমি তাঁকে চাইনা, তাই পাইনা। যথার্থই যদি তাঁকে চাই তবে পাই। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে হাহাকার কর্‌তে কর্‌তে দেখি, পেছনে পেছনে কে ফেরে! ' কে তুমি, তুমি কে আমার পিছনে? একবার দুবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে চিনে ফেলি পরিপূর্ণমানন্দং পরিপূর্ণমানন্দং—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পূরে গেল, তাঁর ভাষা নাই, শব্দ নাই। মনে হয় কত কি বল্‌ব, তাঁর কথা কত কি প্রকাশ কর্‌ব, কিন্তু তখন নির্ব্বোধের মত অজ্ঞানের মত হয়ে যাই। তাঁর উপমা

নাই, দৃষ্টান্ত নাই, তুলনা নাই, বোবার স্বপ্ন দেখার মতন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

---

(৩)

তাঁহাকে পাইবার জন্য কোন ত্যাগকে কি আমারদের ত্যাগ বোধ হইবে? যদি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের আনন্দ লাভ করিতে পারি, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি, তবে তাহা করিতে কি আমরা সঙ্কুচিত হইব? আমারদের হৃদিস্থিত কামনাসকল সংসারের এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের সহিত এ প্রকার জড়িত হইয়া রহিয়াছে, যে তাহা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না; কিন্তু একবার যখন আমারদের নিকটে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়— একবার যখন তাঁহার মঙ্গল ছায়াতে থাকিতে পাই এবং হৃদয়গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়ে, তখন তাঁহার জন্য ত্যাগ করা কেমন সহজ বোধ হয়। তখন মনে হয়, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য সর্ব্বস্ব দেওয়াও কিছু নহে। তখন সংসারের ক্ষুদ্র ভাব আমারদের নিকটে প্রকাশ পায়; তখন ঈশ্বরকে বলি, তোমাকে

কেমন করিয়া চিরদিন হৃদয়ে রাখিয়া দিব। তুমি আমার সকলি গ্রহণ কর, আমাকে তোমার নিকটে রাখিয়া দেও!

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

---

(৪)

নির্লিপ্তভাবে দাতা হইবে ঈশ্বরের এই আজ্ঞা, তাঁহার দৃষ্টান্ত এবম্প্রকার। অন্যকে যদি রাজা করিতে পারি নিজে প্রজা হইব। বিষয়ের সকল সুখ অপরকে দিব যাহারা সেই সুখের জন্য লালায়িত। দাতা হইলাম, নির্লিপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু নিজে কি সুখী হইলাম? অন্যের ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিতে গিয়া নিজে কি অতীন্দ্রিয় সুখ পাইলাম? অপরকে সুখী করিতে গিয়া আমরা যদি নিজে সুখী না হই, সেই বৈরাগ্য কেবল কষ্টের কারণ। অন্যকে সুখী করিবার জন্য জীবন, সুস্থতা এবং প্রাণের শেষ রক্ত পর্য্যন্ত দিলাম; কিন্তু আমার অন্তরে দুঃখ থাকিবে না। নির্লিপ্তভাবে পরসেবা করিলাম বটে; কিন্তু যতই পরের সুখের জন্য নিজের সুখ পরিত্যাগ করিলাম, ততই অন্তরে গভীরতর সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। অন্যের সুখ বর্দ্ধন করিতে গিয়া অকারণে

আমরা কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিব ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে। উপবাস করিয়া কষ্ট পাইয়া শরীরকে শুষ্ক করিতে হইবে ইহা মনুষ্যের কৃত্রিম ধর্ম্ম। দুঃখের সাগরে নিমগ্ন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদের হস্তে তাঁহার ধর্ম্মরত্ন দান করেন নাই; কিন্তু তিনি যেমন চিরপ্রসন্ন আমাদিগকেও সেইরূপ চিরপ্রসন্ন করিবার জন্য তিনি যথার্থ বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে আদেশ করেন। বৈরাগ্যদ্বারা আমরা যে কেবল সুখ ছাড়ি তাহা নহে; কিন্তু ইহাদ্বারা আমরা অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করি। ত্যাগ স্বীকার যিনি অনুভব করেন তিনি প্রকৃত বৈরাগী নহেন। যথার্থ বৈরাগী কিছুই ত্যাগ করেন না বরং লাভ করেন। তিনি দিলেন কি? প্রাণ। পাইলেন কি? অনন্ত প্রাণ। ঈশ্বরের ভাণ্ডারে যেমন "দাও দাও, কিছুই রাখিয়ো না" নিত্য এই মহাবাক্য উচ্চারিত হইতেছে, প্রকৃত বৈরাগ্যেরও সেই

বাক্য। ব্রহ্ম এত দিতেছেন তথাপি তাঁহার কিছুরই শেষ হইতেছে না কেন? যিনি অনন্ত সুখের সমুদ্র, দান করিলে কি তাঁহার প্রেম-জলের শেষ হয়? সেইরূপ ব্রহ্মসন্তান যিনি এই সমুদ্রে সাঁতার দিতেছেন, তিনি ব্রহ্মকে দৃষ্টান্ত করিয়া কেবলি বিতরণ করিতেছেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

---

(৫)

তুমি কেন শোকে মগ্ন হইয়াছ, বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়াছ, শান্তিহীন হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছ? যাঁর প্রীতি-সুধাতে জগৎ-সংসার জীবিত রহিয়াছে, তাঁর প্রেমরূপ মঙ্গল-মূর্ত্তি দর্শন কর এবং দুঃখসন্তপ্ত অশ্রুধারাকে প্রেমাশ্রুধারাতে পরিণত কর। সেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদায় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যার কখনই আর ক্ষয় হয় না; যাঁর সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয় না; তাঁহারই প্রেমে মগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর। উত্থান কর, মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা ধর্ম্মপথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন; ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, সেই দুর্গম পথও সুগম হইবে। ধর্ম্মের অনুগামী হইতে হইলে সুখদুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইতে হয়। ধর্ম্ম সুখেতেও বর্দ্ধিত হয় এবং দুঃখেতেও বর্দ্ধিত

হয়, সম্পদেও ধর্ম্মের উন্নতি হয়, বিপদেও ধর্ম্মের উন্নতি হয় ; বিপন্ন ব্যক্তিকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন এবং শ্রীসম্পন্ন সজ্জনকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন। এ পৃথিবী আমারদের শেষ গতি নহে, ইহা আমারদের শিক্ষার ও পরীক্ষার স্থান। এখানে ধর্ম্মের জন্য তো দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে, বিপদকে তো আলিঙ্গন করিতেই হইবে। এমন কি, সঙ্কট-বিশেষে, সময়-বিশেষে ঈশ্বরের অভিপ্রায়-বিশেষে, প্রাণ পর্য্যন্তও অকাতরে বলিদান দিতে হইবে। সুখের আশ্বাসে ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুটিলতা কপটতা। সুখেতেও ধর্ম্মের উন্নতি হয় বটে ; কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার কদাপি সুখ নহে। [illegible] সাংসারিক সুখ কি কখন দেব-সেব্য ধর্ম্মের পুরস্কার হইতে পারে? যে সুখ পার্থিব স্বর্ণমুদ্রার উপর নির্ভর করে, যে সুখ রক্ত মাংস স্নায়ু শিরার উপর নির্ভর করে, যে সুখ প্রবঞ্চনা করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তাহাই কি ধর্ম্মের পুরস্কার হইল ?

ধর্ম্মের পুরস্কার নিজেই ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুরস্কার আত্মপ্রসাদ, ধর্ম্মের পুরস্কার স্বয়ং ঈশ্বর। অতএব হৃদয়ের প্রীতি উজ্জ্বল করিয়া হৃদয়েশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর, আপনার ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভাবের ভাবুক হও। তোমার আপনার জন্যে কিছুই রাখিও না, সকল তাঁহাতেই সমর্পণ কর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

(৬)

তুমি ক্রমে ক্রমে আমার মধ্যে একি অভিনব অদ্ভুত জীবনের সঞ্চার করিতেছ। বহু আয়াস, বহু পতন উত্থানের পর অল্পে অল্পে স্বভাব একি নূতন অবয়ব লাভ করিতেছে। ঠিক যেন আমি আর সে লোক নাই। আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ আছে, কিন্তু দেখ এ-সকল ইন্দ্রিয় কেমন অধ্যাত্মপথের সহায় হইয়াছে; স্বভাব-নিকেতনের মধ্যে তোমার গমনাগমনের দ্বার কেমন উন্মুক্ত হইতেছে। তুমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছ। এইসকল মানসিক ভাব, রুচি, প্রবৃত্তি, স্পৃহা, কল্পনা পূর্ব্বের ন্যায় তীব্র বটে, কিন্তু তোমার পরমাশ্চর্য্য প্রভাবে দিব্যাকৃতি পাইয়া অবিরল যোগে অনুরাগে তোমারই মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, আরও হইবে। স্বশরীরে সংসারে থাকিতে থাকিতে, এখানকার

কার্য্য করিতে করিতে এই দিব্যজীবনের আলোকে সমুদায় সংসার রূপান্তরিত হইতেছে! ধরাধাম স্বর্গধাম হইতেছে, আরও হইবে। হে মুক্তিদাতা, এই মহা অদ্ভুত মুক্তিশাস্ত্রের জন্য, এই মহা অদ্ভুত মানব স্বভাবের রহস্য-জন্য তোমাকে সহস্র নমস্কার।

প্রতাপচন্দ্র।

---

(৭)

হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিতে হয়—এ তো বাল্যাবস্থার কথা। এখনও কি তোমায় শুদ্ধ চক্ষু নিমীলন করিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে? সমুদয় দিন চক্ষু খুলিয়া থাকিতে হইবে, দিনের মধ্যে পাঁচ মিনিট মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্মদর্শন করিলে, ইহা স্বাভাবিক অবস্থা নহে? এরূপ সাধনকে উৎকৃষ্ট সাধন বলিতে পারি না, ইহাতে অনেক ঘণ্টা বাদ দিতে হয়, অতি অল্প সময়ে ব্রহ্মদর্শন সুখ হয়। এরূপ অবস্থায় প্রাণ-পণ করিয়াও কেহ আত্মাকে বিষয়কোলাহল-মধ্যে স্থির রাখিতে পারে না। হৃদয় হইতে বাহির হইয়া বহির্জগতের সমুদয় স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। ব্রহ্মদর্শন অভ্যাসে এত ক্ষমতা জন্মান আবশ্যক যে ভিতর হইতে বাহির হইয়া যে দিকে দেখিব, দেখিব ফল, পুষ্প, তরু, লতা, পর্ব্বত, কানন, আকাশ,

সরোবর সকলই ব্রহ্ম আবির্ভাবে হাসিতেছে। উচ্চতর পর্ব্বতশিখরে উঠিলাম, সেখানে ঈশ্বর, জলস্রোতের নিকটে গমন করিলাম, সেখানে ঈশ্বর, সমুদ্রের উজ্জ্বল তরঙ্গজ্যোতি অবলোকন করিলাম, সেখানে ঈশ্বর, কেবল শূন্য আর কিছুই নাই, সেখানেও ঈশ্বর। সকল স্থান ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ, সর্ব্বত্র তাঁহার প্রেমমুখ। চক্ষু নিমীলিত করিয়া ভিতরে আশ্চর্য্য শোভা দেখিতে পাইলাম, দেখিয়া প্রাণ তুষ্ট হইল, হৃদয় সুশীতল হইল। চক্ষু খুলিয়া গেল, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। একি? বাহিরের রাজ্য কি অপদেবতার রাজ্য? যাঁহার ঘর ভিতরে, তাঁহারই রাজ্য বাহিরে, সুতরাং যে হৃদয়বাহিরে তাঁহার দেখা পাইল, তাহার দর্শনের দ্বার আর অবরুদ্ধ হইল না। সে যখন সংসারে ফিরিয়া আসিল, তখনও সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিল। ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেমমুখ দেখিতে পাইল, বাহিরে চারিদিকে

তাঁহার সম্বন্ধে সেই প্রেমমুখ প্রকাশিত রহিয়াছে। ভিতরে বাহিরে কত আনন্দ। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও প্রাণেশ্বরের মুখ দর্শন করিব, চক্ষু খুলিলেও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইব, এই অবস্থা প্রার্থনীয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

---

(৮)

তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র,—কূলকিনারা নেই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, বরফ আকারে জমাট বাঁধে। জ্ঞানসূর্য্য উঠ্‌লে সে বরফ গলে' যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে' বোধ হয় না, তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বল্‌বেন তিনিই নাই, তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান্ না। বিচার কর্‌তে কর্‌তে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না। যেমন প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা ছাড়ালে, এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিন্তু কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে? সেখানে ব্রহ্মের

স্বরূপবোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে বল্‌বে? একটা নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়েছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গলে' মিশে গেল। তখন খবর কে দিবে?

বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্‌ ফড়্‌ করে তর্ক করে। শেষ হ'লে চুপ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

(৯)

"তোমার চক্ষু আমার চক্ষু যেন এক হইয়া যায়" এ প্রার্থনা কখন অগ্রাহ্য হইবার নহে। তিনি যে আমাদিগকে প্রেমনয়নে দেখিতেছেন, তাঁহার সেই দৃষ্টি আমাদিগের উপর নিপতিত রহিয়াছে, আমাদিগের দৃষ্টি তাহা দেখে না। তাঁহার সঙ্গে মিলন হইলে কোন ভয় কোন ভাবনা থাকে না। আশ্চর্য্য এই, পাপের সময়েও এমন শুদ্ধ নয়ন আমার দিকে তাকাইয়া আছে। এ দৃষ্টি কল্পিত দৃষ্টি নয়। আকাশে অগণ্য চক্ষু কল্পনা করিয়া বলিতে পারা যায়, আহা আকাশ কি মধুময় দেখাইতেছে।

কিন্তু সেই অকল্পিত দৃষ্টির নিকটে কল্পনা যাইতে পারে না। সেই দৃষ্টি হইতে যে কিরণ আসিতেছে, সাধক ইচ্ছা করিলেও তাহার একটিকে নিবারণ করিতে পারেন না। এই দৃষ্টিতে অতি সুকোমল বল আছে। উহা মানুষকে হতবুদ্ধি করিয়া সমুদয় কুটিল বুদ্ধি

দূর করিয়া দেয়। একবার সেই দৃষ্টিতে বিদ্ধ হইলে সংসারের সমুদয় অসার জঘন্য সুখ অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারা যায়। তাঁহার নয়নচন্দ্রের জ্যোৎস্না আমার ভক্তি নয়নের মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাঁহার দৃষ্টি আমার উপরে পড়িয়া, তাঁহার প্রেম অনুরাগ আমার চক্ষের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া মধুবর্ষণ করিতেছে। দুই দৃষ্টিতে একটি প্রণালী হইয়া অনন্ত প্রেম আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

;ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(১০)

মানুষ বিষয়ে কি বিজাতীয় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে! মানুষই ইন্দ্রিয়সুখকর দ্রব্য লাভ করিতে সর্ব্বত্রেই যাইয়া থাকে, মহা বিপদেরও সম্মুখীন হয়। ভক্তের চাই এই তীব্র ভালবাসা। ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরাইতে হইবে। তৎপরে বিরহ প্রেমাস্পদের অভাবজনিত মহাদুঃখ। এই দুঃখ জগতের সকল দুঃখের মধ্যে মধুর—অতি মধুর। যখন মানুষ, ভগবানকে লাভ করিতে পারিলাম না, যে জিনিষ জানিবার তাহা জানিলাম না বলিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়, এবং তজ্জন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই বিরহ আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। মনের এইরূপ অবস্থা হইলে প্রেমাস্পদ ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগে না। পার্থিব প্রেমে উন্মত্ত প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ প্রায়ই দেখা যায়। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর

যথার্থ প্রণয় হইলে তাঁহারা যাহাদিগকে ভাল না বাসেন, তাঁহাদের নিকট থাকিতে স্বভাবতই একটু বিরক্তি অনুভব করেন। এই রূপে যখন পরাভক্তি হৃদয়ে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন ঐ ভক্তির বিরোধী বিষয়সম্বন্ধে মনে এইরূপ বিরক্তি হইতে থাকে। তখন ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা কহাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠে।

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।

তাঁহার বিষয়ে, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর। যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্তা কহেন, ভক্ত তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা কহেন, তাঁহারা তাঁহার পক্ষে শত্রুরূপে প্রতীয়মান হন। যখন ভক্তের এই অবস্থা আসে যে, এই শরীর ধারণ কেবল একমাত্র

তাঁহার উপাসনার জন্য, তখন তিনি ভক্তির আর এক উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। তখন উহা ব্যতীত এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন ধারণ করা অসম্ভব বোধ হয়, আর সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবন ধারণে সুখ বোধ হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম তদর্থ প্রাণ-সংস্থান। যখন তিনি ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শবলে কৃতার্থ হইয়া যান, তখন তাঁহার প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া যায়, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; তখন তাঁহার জীবনের সমুদয় সাধ পূর্ণ হইয়া যায়।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো-নির্গ্রন্থাঃপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূত গুণোহরিঃ।
- শ্রীমদ্ভাগবত।

হে রাজন্, হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে তাঁহারা একেবারে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হইয়াছে,

তাঁহারাও ভগবানকে নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রেমের প্রভাবই এই। যখন একেবারে 'আমি আমার' জ্ঞান থাকে না, তখনই এই তদীয়তা লাভ হয়। তখন তাঁহার নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই যে তাঁহার প্রেমাস্পদের। এই-রূপে যে ভগবানকে ভালবাসে, সে সমুদায় জগৎকেও ভালবাসে, কারণ সমুদায় জগৎ তাঁহার।

স্বামী বিবেকানন্দ।

(১১)

এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, যাঁহাদের প্রকৃতিতে ভাবের মাত্রা কিছু বেশী। একটা কথা শুনিতে না শুনিতে, একটা অবস্থা আসিতে না আসিতে, তাঁহাদের ভাব উছলিয়া উঠে। তাঁহারা যেন না পাইয়াও পেয়েছি পেয়েছি বলিয়া ছুটিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়েন। 'এইত হৃদয়ে রে' এই সঙ্গীত যেই উঠিয়াছে, অমনি তাঁহাদের বোধ হইতেছে যেন সত্য সত্যই ঈশ্বরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। চিত্তের এই ভাব-প্রবণতার দুই বিপদ আছে,—প্রথমে ইহাতে এক প্রকার ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তি উৎপন্ন করে। চিত্ত ভাবেই পরিতৃপ্ত হইয়া মনে করে, ঈশ্বর সম্বন্ধে ও ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা তাহা করিয়াছি। তাঁহারা ভাবের পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া সারবান জীবনরূপ অমৃতময় ফলের প্রতি উদাসীন। ভাবের মিষ্টতাই তখন তাহার প্রধান

লক্ষ্য হয়, তখন সে তাহাই অন্বেষণ করে ও তাহাতে পরিতৃপ্ত থাকে। যেমন অনেক সুরাপায়ী সুরাজনিত নেশাটুকুই চায়, সুরা নামক পদার্থের প্রতি বিশেষ নির্ভর নাই, সুরা-দ্বারা যে নেশা হয়, ইথর বা ওডিকলোং খাওয়াইয়া যদি সেই নেশাটুকু করিয়া দিতে পার, তবে ইথর বা ওডিকলোংই ভাল, সুরাতে প্রয়োজন কি ? তেমনি এই শ্রেণীর লোকের মনের ভাব এই, ঈশ্বরের নামে ভাবের যে মিষ্টতা হইতেছে, যদি সাকার পূজাতে তাহা হয় বা তদপেক্ষা অধিক হয়, তবে ঈশ্বরকে লইয়া মারামারি করাতে কাজ কি ? ভাবুকতা যে কেবল ধর্ম্মজীবনের আদর্শ সদ্‌গুণ লাভের পক্ষেই ব্যাঘাত করে, তাহা নহে, দোষ পরিহার বিষয়েও সমূহ ব্যাঘাত করে।

শিবনাথশাস্ত্রী।

---

(১২)

যখন আকুল আরাধনায় প্রেম ও পুণ্য সরোবরে মগ্ন হও, তখন হে আত্মন্ তোমার কি অবস্থা হয়, তখন তুমি পাপী না নিষ্পাপ, তখন তুমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে ? যখন সাধু সাধ্বীগণ নিষ্ঠাভক্তিতে তোমার চারিদিকে বসিয়া ধ্যান প্রার্থনায় শুদ্ধচিত্ত ও দেবতুল্য আকার ধারণ করেন, তাঁহাদের সহবাসে ও সংস্পর্শে তোমার কিরূপ অবস্থা হয়, অপবিত্র না পবিত্র, স্বর্গীয় না সাংসারিক ? ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে সে অবস্থায় আদর্শ জীবন লাভ করি, সদ্যোমুক্তি সম্ভোগ করি।

কিন্তু এ সাময়িক অবস্থাকে নিত্য অবস্থায় পরিণত করিবার জন্য যে সাধন তাহাই কঠিন, প্রায় অসাধ্য। প্রতিজনের অন্তরে একটি কি দুইটি বিশেষ প্রবৃত্তি প্রবল। প্রথমতঃ তাহাকে আক্রমণ করিবে ; সেই প্রবলকে অবলম্বন করিয়া নানা অপ্রবল প্রবৃত্তি রাজত্ব

করে। কারণ রিপুপ্রবৃত্তি বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন নহে, মূলে একই পদার্থ। তাহাকে ত্রিগুণজড়িত প্রকৃতিই বলি, মায়ামোহ অবিদ্যাই বলি, প্রলোভন পাপই বলি, মূলে একই কথা। এই বিচিত্র অখণ্ড মানবপ্রকৃতি নানা অবস্থায় নানা বিপুপ্রবৃত্তি নামে উক্ত হয়, এবং দুই একটি বিশেষ পাপ ও পাপের জাগ্রৎসম্ভাবনারূপে চরিত্রমধ্যে কার্য্য করে। যে রাগী, তমঃপ্রধান, অভিমানী ও অবোধ সে উত্তেজিত হইলে অবকাশ ও অবস্থা অনুসারে কখনও বিদ্বেষী বা কুটিল বা দৌরাত্ম্যকারী বা যাথার্থ্যবিহীন হইবেই হইবে। সে যদি শান্ত, অক্রোধ হইয়া আত্মগরিমাকে খর্ব্ব করে, অন্ততঃ বাহিরে চাপিয়া চলে, তবে সেই সঙ্গে অন্য প্রকার শত দোষকে দমন করিতে পারিবে। কিন্তু যাহা দমন করা প্রয়োজন তাহা ভুলিয়া গিয়া, যাহা অপ্রয়োজন, কি তত প্রয়োজন নয় তাহা জয় করিবার চেষ্টায় যদি

সে বলক্ষয় করে, তবে কি গুরুতর কি লঘুতর কোন রিপুই সংযত হয় না। হে মহাপ্রকৃতি তুমি ভিন্ন ভিন্ন রিপুকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছ, একটি বিশেষ রিপুর অন্তর্গত করিয়াছ, সেই বিশেষকে ছেদন করিলে আর আর অনেকগুলি অসৎ প্রবৃত্তিকে ছেদন করা হয়।

কিন্তু পরমার্থদর্শী লোক ইহাও বুঝিতে পারেন যে তোমা-রচিত কোন রিপুপ্রবৃত্তি মূলে পাপজনক নহে কেবল যখন মানুষ তাহা লইয়া আত্মচরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়।

প্রতাপচন্দ্র।

---

(১৩)

পরমেশ্বর যিনি তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈপুরুষঃ।" তিনি কেবল পরমবস্তু নহেন; কিন্তু তাহা হইতেও অধিক, তিনি পরমপুরুষ। তাঁহাকে আদিকারণ বলিলেই তাঁহার ভাব ব্যক্ত হয় না; তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ অনাদি কারণ বলিলেও তাঁহার সকল ভাব প্রকাশ হয় না। যে পর্য্যন্ত না তাঁহাকে পরমপুরুষরূপে দেখিতে পাই তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, তাঁহার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি না করি, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে জীবিত ঈশ্বররূপে দেখি না। এক অন্ধশক্তি এই জ্ঞানপ্রাণপূর্ণ জগতের কখনই কারণ হইতে পারে না। ইহার মূলে জ্ঞানস্বরূপ প্রেমস্বরূপ পরম পুরুষ আছেন। বস্তুর সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভাব নাই। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব ও শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব প্রকাশিত হয়। বস্তুর স্বভাব এই যে, নিয়োজিত হয়, পুরুষের স্বভাব এই যে, নিয়োগ

করে। যাঁহারা ঈশ্বরকে পরমপুরুষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সৃষ্টির ভাব মনে করিতে গিয়া নানা ভ্রমে পতিত হন।

তাঁহারা প্রকৃতির অতীত শক্তিকে না দেখিয়া, প্রকৃতি হইতেই সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, বীজ হইতে যেমন যব-ব্রীহি উৎপন্ন হয় ঈশ্বর হইতে জগৎ সেইরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সঙ্গে একীকৃত করিয়া ফেলেন, অনেকে জগৎকারণকে কেবল এক অন্ধশক্তির ন্যায় বিবেচনা করেন। এক অন্ধ দৈবশক্তিকে জগতের আদিকারণ বলা চলে না, এক মহান্ পুরুষের ইচ্ছা ইহার মূলে দেদীপ্যমান। তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান, কর্তৃত্ব এবং মঙ্গলভাব সকলই আছে। সেই স্বতন্ত্রশক্তি, সেই পরমপুরুষ,

সেই জীবিত ঈশ্বরই পরমকারণ। তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু অপর কাহারও সাহায্য ব্যতীত আপন ইচ্ছাতে, আপন মঙ্গলভাবে এই সমস্ত রচনা করিয়াছেন। তিনি অন্য কাহারও দ্বারা নিয়মিত হয়েন নাই, কিন্তু আপনার স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়াতে এই সকলই সৃজন করিলেন। তাঁর মঙ্গল নিয়মে সকলি নিয়মিত হইতেছে। সকলেই তাঁহার মঙ্গল শাসন প্রচার করিতেছে! তিনি নিজে যে প্রকার মঙ্গলময় ও আনন্দময়, জগৎকেও সেই মঙ্গলভাবে ও আনন্দরসে পরিপূর্ণ করিলেন। সেই আশ্চর্য্যময়েরই এই আশ্চর্য্য জগৎ। উন্নতিই ইহার জীবন। পৃথিবীর মুখশ্রীর উন্নতি হইতেছে, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে, মঙ্গলভাব প্রচারিত হইতেছে। সেই সনাতন পুরাণই একভাবে চিরকাল রহিয়াছেন, আর সকলকেই তিনি উন্নতির মুখে ত্যাগ করিয়াছেন! তাঁর সৃষ্টিতে কিছুই

পুরাতন থাকিতে পারে না; সকলই নূতন নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। সেই আনন্দময়ের এই জগতে সকলেই নূতন ও সুন্দর ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। জড়জগৎ হইতে আত্মাকে তিনি আরো উন্নতিশীল করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে এখানকার ভাবে এখানকার সুখেই তৃপ্ত করেন নাই; তিনি ক্রমাগতই তাঁহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন— তাঁহার জ্ঞান-ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিতেছেন। উন্নতিই আত্মার প্রাণ, উন্নতিই আত্মার জীবন। ইহাতে যে সকল ভাবকলিকা নিহিত করিয়াছেন, তাহা এখানেই প্রস্ফুটিত হইয়া গিয়া একেবারে বিনাশ পাইবে না। এখানে ইহার জ্ঞানের শেষ হইবে না, প্রেমের শেষ হইবে না, আনন্দের শেষ হইবে না। আমরা যদিও এখানে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি, কিন্তু তিনি আমারদিগকে দান করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না। আমরা যতই আনন্দের

উপরে আনন্দে অভিষিক্ত হইতেছি এবং উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিতেছি, তিনি বলিতেছেন এ অপেক্ষাও তোমার উন্নতির প্রয়োজন। এই প্রকার তিনি তাঁহার উন্নতিশীল আত্মাকে ক্রমাগতই আপনার দিকে লইয়া যাইতেছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

(১৪)

জ্ঞান যাঁহাকে পরম সত্য বলিয়া ধরিল, প্রেম তাঁহাকে প্রেমাস্পদ বলিয়া আলিঙ্গন করিল, এখানেও অধ্যাত্মযোগের পরিসমাপ্তি হইল না। তাঁহার সহিত আমাদের আর এক যোগ সম্ভব। তাহা ইচ্ছার যোগ। প্রেমের এই এক আশ্চর্য্য মহিমা যে ইহা মানুষকে স্বাধীন রাখিয়াও পরাধীন করে। মানবাত্মা অজ্ঞাতসারে প্রেমাস্পদের ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে একীভূত করে; এবং তাঁহাতেই আনন্দলাভ করে। যতক্ষণ প্রীতি হৃদয়ে পদার্পণ করে না, ততক্ষণ বাধ্যতা ঘোর ভারস্বরূপ বোধ হয়। যে শাসনশক্তি বাহির হইতে আসে ও প্রেমহীন হৃদয়কে শাসন করে, তাহাতে ঘোর দাসত্ব, কিন্তু যে শাসনশক্তি প্রেম হইতে জন্মগ্রহণ করে ও অন্তর হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। ভগবদিচ্ছা ধর্ম্মনিয়মরূপে মানবাত্মাতে নিহিত

রহিয়াছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক আত্মাকে অধীন করিতে চাহিতেছে। প্রীতির অভাবে কতবার আমাদিগকে এই বলিয়া দুঃখ করিতে হইতেছে, জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ—হায় হায়, ধর্ম্মকে জানি অথচ তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না, অধর্ম্মকে জানি অথচ তাহা হইতে নিবৃত্তি হয় না। এমন কেন হয়? বিশ্বাস ও প্রেমের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। তাঁহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে, তাঁহাতে অকপট প্রীতি স্থাপন করিলে আমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতে থাকে। আমরা অনেক সময় এই ইচ্ছাকে জানিয়াও তাঁহার অধীন হইতে পারি না। যতই আমাদের প্রকৃতি তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতে থাকে, ততই তাঁহার সহিত আমাদের যোগ গাঢ়তর হইতে থাকে।

শিবনাথ শাস্ত্রী।

(১৫)

যাহাতে আমরা অমৃতের অধিকারী হইতে পারি, তিনি আমারদের আত্মাকে এই প্রকার বলবান্ করিয়াই সৃজন করিয়াছেন। তিনি আপনি যেমন মুক্তস্বভাব, আত্মাকেও সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। তিনি আর সমুদয় প্রকৃতিকে অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন; কেবল আত্মাকেই তাহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। জল যেমন তুষার দ্বারা বদ্ধ হইয়া ঘনীভূত হইয়া যায়, জগৎ সংসারও সেইরূপ তাঁহার নিয়মে বদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু যখন সেই তুষার-বদ্ধ জল সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হয়, তখন যেমন তাহা বেগবতী স্রোতস্বতী হইয়া বসুন্ধরাকে সিঞ্চন করত উর্ব্বরা ও ফলবতী করে; আত্মাও সেইরূপ তাঁহার অমৃত তেজ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া সকল স্থানেই আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গলভাব বিস্তার করিতে যায়। সেই নদীর ন্যায় তখন সে আর কোন বাধাকেই

বাধাজ্ঞান না করিয়া, সকল স্থানকে মঙ্গল-নীরে প্লাবিত করিতে করিতে সেই অমৃত-সাগরে আসিয়া পতিত হয়; আপনার কর্তৃত্বভাব কথনই পরিত্যাগ করে না।

ঈশ্বর আত্মাতে আপনার সাদৃশ্য প্রদান করিয়াছেন; সমুদয় জগৎসংসারকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ করিয়া আত্মাকে ধর্ম্মের নিয়ম দিয়াছেন। সে নিয়মে বাধ্যতা নাই, কিন্তু সকলি স্বাধীনতা। মনুষ্য যতদূর শরীরী জীব, যতদূর তিনি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির এবং পশুপ্রকৃতির অধীন, ততদূর তিনি জড় জগতের নিয়মাধীন। জড়ের উপর তাঁহার যতদূর নির্ভর, ততদূর তিনি বস্তু— আপনার কর্তৃত্বের উপর যত চলিতে পারেন, তাহাতেই তিনি পুরুষ। এই শরীর আমার, কিন্তু আমি নহি। আমি বিজ্ঞানবান্ পুরুষ, আর এই ইন্দ্রিয়সকল আমার কার্য্য করিতেছে। আত্মার এ প্রকার কর্তৃত্বশক্তি যে, যে প্রকৃতির

দ্বারা সে আবৃত ও অনুবিদ্ধ, তাহার উপরেও তাহার আধিপত্য রহিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যেই কেবল বদ্ধভাব দেখিতে পাই। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, এমন এক অভেদ্য কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা তাহাতেই বিস্তৃত দেখি। প্রকৃতির মধ্যে কর্ত্তৃত্বভাব, স্বতন্ত্রশক্তি কিছুই দেখা যায় না। প্রকৃতি অন্ধের ন্যায় কার্য্য করে, এবং না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করে। প্রকৃতি মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। যাহা অমৃত, যাহা বুদ্ধমুক্ত, তাহার ভাব ইহাতে কিছুই নাই। মানুষকে তিনি প্রকৃতির অতীত শক্তি দিয়া আপনার আরো নিকটে আনিয়াছেন। মনুষ্য বিজ্ঞানদ্বারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন। তিনি আপনাআপনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি কেবল এক অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলেই বদ্ধ নন্—তিনি আত্মপ্রভাবে তাহা অতিক্রম করিতে পারেন। তিনি আপনাতে এ প্রকার ধর্ম্মের নিয়ম দেখিতে পান্, যাহা

তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে এবং আপনার এ প্রকার কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে পারেন যে তাঁহার প্রবল ইন্দ্রিয়দলের সহস্র উত্তেজনার প্রতিকূলেও সেই ধর্ম্মনিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন; ঈশ্বর মনুষ্যকে এই প্রকার স্বাধীনতা অলঙ্কার দিয়াছেন।

তিনি যদিও তাঁহাকে কঠোর বিপদে আবৃত করেন, সে কেবল তাঁহাকে আরো বলীয়ান করিবার জন্য। আত্মাকে তিনি সেই প্রকার বলে বলী করিয়াছেন, যাহাতে সে পথের সমুদয় বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহার পদতলে আসিয়া অবনত হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

---

(১৬)

আমাদের মহাভ্রম এই যে, আমরা মনে করি যে কোন প্রকারে হউক, শরীরকে রক্ষা ও উহার স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে হইবে। যদি জানিতে পার, তুমি শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহার সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে। তখন তুমি সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতার অতীত হইয়া গেলে। এই হেতু ভক্ত বলেন, আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে মৃতবৎ থাকিতে হইবে, এবং উহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ—শরণাগতি—যাহা হইবার হউক্। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' এই বাক্যের অর্থই এই প্রকার আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। সংসারের সহিত সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই আমাদের দুর্ব্বলতা ও সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া

থাকে, নির্ভরের অর্থ তাহা নহে। হইতে পারে, আমাদের স্বার্থপূর্ণ কার্য্যাদি হইতে ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হয় কিন্তু উহা ভগবানের ভবিষ্যৎ অভিপ্রায় মাত্র। প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখন কোন ইচ্ছা বা কার্য্য করেন না।

"প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে, আমি দরিদ্র, আমি অকিঞ্চন, আমার দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।" ইহাই ভক্ত-হৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমন কি, মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগসুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ।

(১৭)

ভাবিতেছিলাম ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিলেন কেন? ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনি এই উত্তর উপস্থিত হয়, অধীন করিবার জন্য স্বাধীন করিয়াছেন। একথা শুনিলে সঙ্গত বোধ হয় না। পশ্চিম দিকে লইয়া যাইবার জন্য কে পূর্ব্ব দিকে লইয়া গিয়া থাকে? অন্ধকার ও আলোকের প্রভেদ কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবে? শাদা ও কালতে যত প্রভেদ স্বাধীনতা ও অধীনতায় তত প্রভেদ। স্বাধীন হইয়া অধীন হওয়া যায়, এ যে বিপরীত কথা! স্বাধীনতা অধীনতার অর্থই যে বিপরীত! এক পথ দিয়া বিপরীত পথে কিরূপে লইয়া যাইবে? এরূপ করিবার গূঢ় অভিপ্রায় কি? যাঁহার জ্ঞান শক্তি অসীম, তিনি এ প্রকার কার্য্য করিলেন কেন? তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে জড় করিয়া এমন কঠিন নিয়মে বাঁধিয়া দিলেন যে, তাহারা সেই অবধি এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র নিয়ম

অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাবৎ ভৌতিক পদার্থকেই অধীন করিয়া সৃজন করিলেন! এইরূপ অধীন করিয়া সৃষ্টি করাতেই জগতের মঙ্গল, মনুষ্য জাতির উন্নতি। জগতের সমুদয় পদার্থের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিলে, সে জগৎ থাকিত না। জনসমাজের উন্নতিই বা কোথায় থাকিত? ব্রহ্মাণ্ড নিয়মে আবদ্ধ, ইহাতে উহার আপনার কল্যাণ, মনুষ্যজাতির কল্যাণ। জীবজন্তু সকলেই স্বভাবের অধীন, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এ দুয়ের মধ্যে তাহারা থাকিতে পারে না।

পিতা পুত্রকে স্বাধীনতা দিলেন, এই জন্য যে উহা অধীনতার পক্ষে উপায়। আপাততঃ ইহা অসঙ্গত বোধ হয় কিন্তু বিশ্বাস করিতে হইবে। মনুষ্য স্বাধীন ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কখন জ্ঞানের পথে, কখন অজ্ঞানের পথে, কখন ধর্ম্মের পথে কখন অধর্ম্মের পথে গমন করে। এইরূপ গমন কেবল স্বাধীনতা হইতে অধীনতায় আনিয়া

দিবার জন্য। স্বাধীনতা প্রস্ফুটিত হইয়া অধীনতা জন্মে।

অধীন ভাবে কিছু দেওয়া যায় না, কিছু বিনিময় করা যায় না। পূর্ণ স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে তিলার্দ্ধ অধীনতা থাকিবে না। বিপাকে পড়িয়া স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছি এ কথা বলিতে না পারা যায়, এ জন্য ঈশ্বর বিপাকে ফেলিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা গ্রহণ করেন না। স্বাধীনতা আনন্দের সহিত বিক্রয় করিব।

আমি আমি তুমি তুমি এ ভ্রম চলিয়া গেল, সমুদয় ঈশ্বর তোমারি হইল! এক নিমেষ পূর্ব্বে অধিকার ছিল, যাই স্বত্ব পরিত্যাগ করিল, পৃথিবীর আইনমতে আর তাহাতে অধিকার থাকে না। ধর্ম্মরাজ্যেও স্বত্ব ত্যাগ করিলে আর তাহাতে অধিকার থাকে না।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(১৮)

অধীনতা-ব্রতে পাঁচ কোটী পাঁচ সহস্র লোক এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ হয় হউক, অনৈক্য-সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলন-বন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, পর-সেবায় আনন্দলাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন হইয়া, সমস্ত জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইবে, তখন এই তার চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, এ সময়ে বিপদ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহুবিচারদ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয়

৪৯

না। অধীনতার মধ্যদিয়া স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না, পুস্তক না পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল অনায়াসে লভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া যায়। দীনতা না স্বীকার করিলে বুঝা কষ্টকর।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

---

(১৯)

রূপগোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন যে ভাবের অঙ্কুর মাত্র হৃদয়ে উদিত হইলে, এ সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথা,--

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং, বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে, প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

প্রথমতঃ -যদি ভাবের অঙ্কুরও হয়, তবে তাঁর ক্ষমা হবে। তিনি আমার প্রভু, চরাচর ব্রহ্মাণ্ড, এই সব নরনারী তাঁর আমার প্রিয়তমের - আমার প্রভুর, এরূপ যথার্থ জ্ঞান হইলে যদি কেহ আমাকে নির্য্যাতন করে, অপমান করে, তখন আমি বলিব খুব্ কর, তোমরা আমার প্রিয়তমের, আমি কি তোমাদের কিছু বলিতে পারি? তোমরা আমার নির্য্যাতন কর, খুব্ কর।

দ্বিতীয়তঃ—সেইব্যক্তি কাল ব্যর্থ যাইতে

দেয় না। যাহাতে প্রভুব নাম নাই, সেবা নাই, অর্চ্চনা নাই, এমন কার্য্য তিনি করিতে পারেন না। একটি শ্বাসপ্রশ্বাস, ব্যর্থ যাইতে দেন না। কখনও সৎসঙ্গে, কখনও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে, কখনও প্রভুর সেবাতে রত থাকেন।

তৃতীয়তঃ—তাঁহার জীবন বৈরাগ্যময় হইয়া যায়। তিনি সর্ব্বদাই "আর সব অসার, আমার প্রভুই সার, আমি তাঁ ছাড়া আর কিছু বুঝি না, আর সব তাঁর সৃষ্ট" ইহাই ভাবিয়া থাকেন। বনে যাওয়া, গৈরিক পরা, ছাই মাখা, কৌপীন পরা বৈরাগ্য নয়; গোস্বামীরা এই সকলকে মর্কটবৈরাগ্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যথার্থ বৈরাগ্য কি? না, অনাসক্তি।

চতুর্থতঃ—সেই জীবনে মানশূন্যতা লক্ষিত হয়। যাঁহার সর্ব্বদাই অনন্তের দিকে দৃষ্টি থাকে, তিনি নিজেকে ধূলি হইতেও লঘু মনে

করেন। যিনি তা নন, তিনিই নিজেকে বড় ভাবিয়া থাকেন। যে অনঙ্গেতে সব ডোবা দেখে, সকলকে সে সুন্দর দেখে, মর্য্যাদা করে। নিজকে সে দেখে না, আর সকলকে দেখে, তাই আর অহঙ্কার আসিতে পারে না।

পঞ্চমতঃ—তাঁহার প্রাণে আশাবদ্ধসমুৎকণ্ঠা থাকে, "এই আমার প্রিয়তম, এইযে প্রভু, আর ভয় নাই" এই বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। তিনি নিজের জন্য প্রভুর কাছে কিছু বলেন না, প্রভু খেতে দাও, পরতে দাও এরূপ কিছুই প্রার্থনা করেন না। বৃক্ষ যেমন ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র প্রভৃতির অত্যাচার সহ্যকরিয়া স্থির হইয়া থাকে, তিনি তেমনি দুঃখ বিপদে অটল হইয়া থাকেন। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, ওকথা ঋষিরাও বলিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠতঃ—ভগবানের নামগানে সর্ব্বদাই তাঁর রুচি। তিনি যে নাম করেন, করিতে হবে

বলিয়া নয়, রুচির সঙ্গে। তাঁর স্থর মিলিল কি না, বাজ্য হইল কি না, এ সকলের প্রতি দৃষ্টি নাই, কেবল নামই তাঁর লক্ষ্য। পথের মুটে মজুরে যে নাম করে, তাহা শুনিয়া 'ও কে নাম কল্লেরে' বলিয়া মোহিত হইয়া যান।

সপ্তমতঃ—তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের গুণ বর্ণনে আসক্ত থাকেন। তিনি দেখেন, ঐ পাহাড়পর্ব্বত, ঐ নদীসমুদ্র, ঐ তরুলতা, ঐ পশুপক্ষী, ঐ আকাশের চন্দ্র তারা, সমস্ত চরাচর, কত যোগীন্দ্র, কত মুনীন্দ্র সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করিতেছেন। তিনি পরমেশ্বরের গুণের কথা যত বলেন, ততই আরও অধিকতররূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন; বলিয়া কিছুতেই তাঁহার আশ মিটে না।

অষ্টমতঃ সেইব্যক্তি ভগবানের বাসস্থান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণের মত ভাল বাসিয়া থাকেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি কোন ব্যক্তি বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিতেছিলেন,

তাহা দেখিয়া পরমেশ্বরের এক ভক্ত, নিজের অঙ্গ ভাঙ্গিলে যেমন শব্দ বাহির হয় সেইরূপ "উহু উহু" করিয়া উঠিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

---

(২০)

কোন গৃহ-নির্ম্মাতা, কি পোত-নির্ম্মাতা যেমন গৃহ ও পোত নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়া যায়, তাহারদের সঙ্গে পরে তাহার আর কোন সংস্রব থাকে না; তিনি কি সেই প্রকার চলিয়া গিয়াছেন, না, অদ্যাপি তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আছেন? সমুদয় আকাশ, সমুদয় কাল তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে; তিনি সকলের সাক্ষীরূপে, সকলের নিয়ন্তারূপে, সকলের যন্ত্রীরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। আমরা সকলেই তাঁহাতে বাস করিতেছি, তাঁহাতেই জীবিত আছি, তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি। যাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি রক্ষা পাইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা যেমন পূর্ব্বে, সেইরূপ বর্ত্তমান সময়েও তাঁহার ইচ্ছা। সৃষ্টিকাল হইতে তাঁহার ইচ্ছাস্রোত প্রবাহিত থাকাতে জগৎসংসার স্থিতি করিতেছে। আমি যখন

বলিতে আরম্ভ করিলাম তখন আমার ইচ্ছা হইল, এখন যে বলিতেছি আমার ইচ্ছার বিরাম হয় নাই; যদি বিরাম হয়, তবে বাক্য স্তব্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরাম হইলে সমুদয় জগৎসংসার প্রলয়দশাপ্রাপ্ত হয়। আমরা তাহাকে এখানেই বর্ত্তমান দেখিয়া— সকলের প্রাণরূপে দেখিয়া, জীবন্তস্বরূপ দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছি। আমি যে এক্ষণে কথা কহিতেছি, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কি আমার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে না? আমাকে কি মৃত দেহের মত দেখিতেছ, কি জীবন্ত মনুষ্যের মত দেখিতেছ? তবে যিনি আমার এই বাক্যের বাক্য, যাঁহার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাতে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যিনি আমার শরীরে প্রাণ দিয়াছেন, সমুদয় জগৎকে জীবন ও প্রাণে পূর্ণ করিয়াছেন, তিনি কি আমা হইতেও জীবন্ত নহেন—তিনি কি প্রাণ-স্বরূপ নহেন? তিনি প্রাণ-স্বরূপ জীবন্ত

দেবতা। সেই প্রাণের চতুর্দ্দিকে সকল জগৎ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহাহইতেই সকলে জ্যোতিঃ ও জীবন পাইতেছে। তাঁহাকে আমরা বর্ত্তমান দেখিতেছি - ভূতকাল স্মরণ করিতে হয় না, ভবিষ্যৎ কালের প্রতিও দৃষ্টির আবশ্যক হয় না। প্রত্যক্ষ যে আলোক এখানে আলোক দিতেছে, প্রত্যক্ষ যে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সকলের প্রাণবিধান করিতেছে এবং আমারদের কথা কহিবার ও শ্রবণ করিবার শক্তি দিতেছে, এ সকলই তাঁহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছার বিরাম হইলে এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়, এই বায়ু স্পন্দহীন হয়, এই বাক্য স্তব্ধ হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

---

(২১)

যতদিন পরমেশ্বরকে জীবন্ত, সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা বলিয়া না বুঝি, ততদিন ধর্ম্ম হয় না। যতদিন পরমেশ্বর আছেন, এটি, যেমন জলে হাত দিয়ে আগুনে হাত দিয়ে হয়, তেমনিধারা প্রতীতি না হয়, ততদিন প্রেম হয় না। তবে প্রথমেই কি তাঁর দর্শন ? না, তা হয় না। আত্মা পবিত্র না হ'লে হয় না। তবে কিনা, যেমন হিমালয় না দেখিলেও নিকটে গেলে ঠাণ্ডা বোধ হয়, সূর্য্য না দেখিতে পাইলেও যেমন কিরণ গায়ে লাগিলেও টের পাওয়া যায়, প্রথমে তেমনি অনুভূতি হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর সাকার কি নিরাকার ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। তিনি নিরাকার, কেননা যাহা সৃষ্ট তার মতন নন্। আবার তিনি সাকার, কেননা তিনি আছেন, নিরাকার বলিয়া শূন্য নন্। সত্য সত্যই তাঁহাকে দর্শন

করা যায়, স্পর্শ করা যায়, শ্রবণ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন করা যায়, তাঁর সেবা করা যায়, ইহা রূপক বা কল্পনা নহে।

যেমন বীজের মধ্য হইতে গাছ হয়, বীজে গাছের সব আছে। শুনেছি, এমন এক যন্ত্র হয়েছে তদ্দ্বারা বীজের মধ্যেই সমস্ত বৃক্ষটি দর্শন করা যায়। তেমনি আত্মা-বীজে ধর্ম্ম-বৃক্ষের সমস্তই আছে। যা নাই, তা হয় না। আত্মাতে যা আছে তারই বিকাশ হয়। যখন বিকৃত ভাবে প্রকাশ পায়, তখনই তাহারা রিপু হয়। যখন হস্তদ্বারা, চক্ষুদ্বারা অন্যায় করি, তখনই উহারা রিপু, ভাল করিবার সময় উহারাই বন্ধু। আত্ম-সুখের নাম কাম। যখন ভগবৎসেবা করি, তখন উহারই নাম প্রেম। যখন ভক্তির উদয় হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়, এই কাম আর রিপু নয়, বাস্তবিক বন্ধু। এই যে ক্রোধ, ইহাকে তেজরূপে ব্যবহার করিলে উহা উপকারী বন্ধু। যখন কেহ অন্যায় করে

তখন উহা দ্বারা নিবারণ না করিলে মনুষ্যত্বই থাকে না। লোভ, পরমেশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করে, অন্যপদার্থে গেলেই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। পরমেশ্বরে মোহ হইলেই মোহ পরমোপকারী, অন্যপদার্থে আসক্ত হইলেই সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। মাৎসর্য্য—পরশ্রীকাতরতা—পরের শ্রী দেখিয়া হিংসা করিব না, কিন্তু সেইরূপ হইতে ইচ্ছা করিব, ইহাই মাৎসর্য্যের সদ্ব্যবহার। আমার যাহা আবশ্যক ভগবান সে সমস্তই আমার মধ্যে প্রদান করিয়াছেন। যে বৃত্তির যাহা বিষয় তাহা না পাইলে সেই বৃত্তি বিকাশ পায় না। ভক্তি-বৃত্তির বিষয় পরমেশ্বর, যতদিন তাঁর সঙ্গে দেখা না হইবে ততদিন আমার ভক্তি হইবে না; ভক্তি না হইলে কাঁদিকাটি যত কিছু করি, কিছুতেই পাপ যায় না।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

---

(২২)

প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্ব্বভূতই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রগাঢ় সর্ব্বগ্রাহী প্রেমের ফল—পূর্ণ আত্ম-নিবেদন। তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সংসারে ভাল মন্দ যাহা কিছু ঘটে, কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নহে। তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ দুঃখ আসিলে বলিতে পারেন, এস দুঃখ। কষ্ট আসিলে বলিতে পারেন, এস কষ্ট, তুমিও আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ। মৃত্যু আসিলে এরূপ ভক্ত মৃত্যুকে সহাস্যে অভিনন্দন করিতে পারেন। "ধন্য আমি, আমার নিকট ইহারা আসিতেছে, আসুক সকলে।" ভগবান ও যাহা কিছু তাঁহার, সেই সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রসূত এই পূর্ণ নির্ভরের অবস্থায় ভক্তের নিকট সুখ ও দুঃখের বড় প্রভেদ থাকে না।

স্বামী বিবেকানন্দ।

(২৩)

যাহার প্রধান নির্ভর নিজ শক্তির উপরে, যাহার প্রধান দৃষ্টি নিজের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপরে, সে মুখে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিলেও অন্তরে অন্তরে তদুপরি নির্ভর করে না। কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় তাহার চক্ষু আত্ম-শক্তির উপরেই পড়ে. নিজ দলবলের উপর পড়ে, ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্যের প্রতি পড়েনা। তাহার মন এ কথা বলে না, ঈশ্বর আমার সহায় আমার ভয় কি, বরং এই কথাই বলে, আমি ঢের বাধাবিঘ্ন দেখিয়াছি, আমাকে কে বাধা দিতে পারে? এজন্য সে মানুষ নূতন কর্ত্তব্যের পথে প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে অগ্রসর হয় না; বিনয়ের সহিত কার্য্য করে না; অহঙ্কারে ফাটিতে থাকে; চারিদিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকে; মনে মনে যেন নিজ বাহুতে তাল ঠুকিতে থাকে।

শিবনাথ শাস্ত্রী।

(২৪)

আমরা অধ্যয়ন করিলে, অধ্যাপক হইতে পারি, জগন্মান্য পণ্ডিত হইতে পারি, শাস্ত্রের আলোচনায় শাস্ত্রী হইতে পারি, বুদ্ধির ব্যুৎপত্তিবলে তার্কিক হইতে পারি; কিন্তু ঈশ্বরকে কদাপি লাভ করিতে পারি না। তাঁহার নিকট যাইতে হইলে শিশুর ন্যায় অকপট ভাবে যাইতে হয়। সরল হৃদয়ে পবিত্র হৃদয়েই পরমাত্মা প্রকাশিত হন। তখন আমি তাঁহার হই—তিনি আমার হন্—যেন সৃষ্টির মধ্যে আর কেহই নাই। তখন আমার হৃদয়ে বসিয়া তিনি তৃপ্ত হয়েন এবং আমার সমুদয় হৃদয়কে সংতৃপ্ত করেন। তখন আমার প্রীতি তাঁহার নিকটে যায়—তাঁহার প্রীতি আমার হৃদয়ে আইসে। এই দুই প্রীতি সম্মিলিত হইয়া অমৃতফল প্রসব করে। যদি অমৃতের সঙ্গে মিলিত হইতে চাও, তবে আত্মাকে পবিত্র কর—সংসারের পঙ্কিল মলিন জল পরিহার

কর—হৃদয়কে তাঁহার ভাবের ভাবুক কর—মনকে তাঁহার প্রেমের প্রেমিক কর। সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহার অনুচর হও।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

---

(২৫)

হে প্রেমসিন্ধু, হে অধমতারণ, ধন্য পৃথিবীর ভৃত্যসকল, ধন্য দাসদাসীগণ। কেননা পরম প্রভুর শুভাশীর্ব্বাদ তাহাদের মস্তকে পড়িবে। তোমার ঘরে দাসদাসী হওয়া সৌভাগ্য। গুরু হওয়া যায়, কিন্তু যে গরিব চাকর হইয়া সকলের পদতলে বসিয়া আছে তাহার সুখের সঙ্গে কি উহার তুলনা হয়? দাসত্ব কেনা কঠিন, সহজে প্রভু হওয়া যায়। গরিব হইতে সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়, সমুদায় অভিমান ছাড়িয়া দিয়া মাটীর মত হইতে হয়। চাকর হইতে গেলে অনেক ত্যাগ করিতে হয়, চাকর হইতে গেলে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। বাড়ীতে যারা থাকে, তাদের ভালবাসি, আর যারা চাকরী করে তাদের নীচ হীন মনে করি। হে সাক্ষী ঈশ্বর, আমি তবে চাকর নই?

যদি সমস্ত মনুষ্যসন্তানের চাকরী না করি, তবে চাকর নই। যে সেবা করে সেই চাকর।

ঈশ্বর, অহঙ্কারে প্রাণ জ্বলে গেল, সকল বিষয়ে আমি বড় হইলাম, বিদ্যাতে ধর্ম্মেতে জ্ঞানেতে বড়। একবার অভিমান চূর্ণ কর, দগ্ধ কর। একবার শ্রীহরি, যত চাকর চাকরাণী আমাদের কাছে বেতন পায় সকলের চরণতলে আমাদের অহঙ্কারী মস্তককে স্থাপন কর। যাহারা আমাদিগকে সেবা করে, যাহারা পয়সা পায় বলিয়া আমাদিগকে নীচ মনে করে, তাহাদিগের নিকটে প্রণত হই। তোমার ভক্তেরাই দাসদাসী।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

---

(২৬)

অন্ধকার চন্দ্রমার মহিমা দেখ, তাহার অমৃত কিরণ সহস্রধারে বর্ষিত হইতেছে; অন্ধ রজত রঞ্জনে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে, বৃক্ষেরা হরিৎবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্য বর্ণে শোভিত হইয়াছে। মাসে মাসে চন্দ্রের শুভ্ররশ্মি এই প্রকারে পতিত হয়, কিন্তু কখন্ তাহার মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া অনন্তের মহিমা অবলোকন করি? তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তোমারদের মধ্যে যাঁহারা গঙ্গাতীরের শুভ্র চড়ার উপরে চন্দ্র-কিরণ ভোগ করিয়াছ, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, গঙ্গাতীরে একাকী কি দুই চারি বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে স্নিগ্ধ মারুতে শরীর যখন শীতল হইল, সকল জগৎ স্তব্ধপুলকে চন্দ্রের অমৃতকিরণ পান করিতেছে দেখিয়া মন যখন আর্দ্র হইল এমন সময়ে কি কাহারও মনে অনন্তের মহিমা উদয় হয় নাই? অবশ্য অনেকেরই হইয়া থাকিবেক।

সেই চন্দ্রমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন যখন সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইল—তখনকার ভাব একবার মনে করিয়া দেখ দেখি, কোন্ অবস্থাতে আমারদের মন সেই অনন্তের মহিমাতে মগ্ন হয়? যখন সে উদাস ভাব ধারণ করে তখন—কি, যখন বিষয় লালসাতে ব্যাকুল থাকে? প্রতি মাসেই আমরা এই চন্দ্র দর্শন করিতেছি, আমারদের হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্রমা কোন্ সময়ে সেই অনন্তের মহিমা প্রকাশ করে—কোন্ মনের অবস্থাতে আমরা চন্দ্রের শোভাতে শোভার আকর পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই? সেই সময়ে, যখন আমারদের মন সংসার হইতে উন্নত হইয়া উদাস ভাব ধারণ করে; তখন বিষয়-কামনা আমারদের মনে স্থান পায় না। এই সংসারের দাস হইয়া যে সময়ে আমোদ কোলাহলে মত্ত থাকি, যখন ইন্দ্রিয়-সেবায় রত থাকি, যখন মনোদেবতাকে উপাসনা করি,

তখন যে দিকে চাই ঈশ্বরের মহিমাকে আর দেখিতে পাই না। মন যখন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ থাকে, তখন আপনার সুখ দুঃখের প্রতি আর আশাভয় থাকে না; তখন সে উদাস-ভাব উদারভাব ধারণ করে; তখন সকলই অনুকূল হইয়া তাহার আন্তরিক সাধুভাব সকলকে পোষণ করিতে থাকে, তখন উষার শোভায়, সন্ধ্যার শোভায়, চন্দ্রের মহিমায়, সেই অনন্তেরই মহিমা প্রকাশিত হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

— —

(২৭)

ভাবিয়া দেখি, আমি কতকগুলি কথা শিখিয়াছি। আত্মচিন্তা করিয়া দেখিলাম, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' প্রভৃতি বলিতেছি, এ কথা-গুলি প্রাণে সংলগ্ন হইতেছে বটে, কিন্তু এই স্বরূপগুলি, বাহির হইতে প্রাণে যাইতেছে, প্রাণ হইতে বাহির হইতেছেনা। এইরূপে উপনিষদের অনেক কথা হৃদয় হইতে বলিতে পারি না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ধর্ম্মের যে সকল কথা বলিতেছি, ইহার কিছুই আমার নিজের কথা নহে—শোনা কথা—শিক্ষা ও সংস্কার মাত্র—কেবল প্রাণের মধ্যে একটি আকর্ষণ আছে, সেটি এই "আমার ও জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। তাঁহার দিকে প্রাণ টানিতেছে, প্রাণ তাঁহাকে জানিতে চায়।" এটি আমি কোথায়ও শিক্ষা করি নাই। এই আকর্ষণটি আমার হৃদয়ের বস্তু। এই আকর্ষণে পড়িয়াই পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরমেশ্বরের

পূজা অর্চ্চনা হইতেছে। তাঁহার নিকট প্রার্থনা উঠিতেছে। এই যে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ, ইহা আমার হৃদয়হইতে সংস্কারের পদার্থ সকলে কাড়িয়া লইয়াছে, আমার হৃদয় যে শূন্য হইয়াছে তাহা কেবল অহঙ্কারে বুঝিতে দিতেছে না।

সেইদিন হইতে বুঝিলাম আমি আমার কিছুই নই। সেইদিন বুঝিলাম আমার মত লোকে আর কি উপদেশ দিবে? ধর্ম্মের যে সকল কথা বলিতেছি, কেউ যদি বলে 'ইহা কি তোমার নিজের কথা?' তখন কি বলিতে পারি, হাঁ, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি? তাই সকলেরই পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, প্রাণে তাঁর প্রতি আকর্ষণ আছে কিনা? প্রাণে ঐ টান থাকিলেই রক্ষা। যেমন নদী শুষ্ক হইয়া গেলেও তাহাতে একটুকু স্রোত থকিলেই একদিন না একদিন উহা সাগরে যাইয়া পড়িবেই পড়িবে, কিন্তু যদি স্রোত একেবারেই

না থাকে, তবে কালে উহা বদ্ধ বিলে পরিণত হইবে, উহাতে কাদা ও দল জন্মিবে, তেমনি আমার প্রাণ যতই কেন শুষ্ক হউক্ না, ঐ ভগবানের প্রতি আকর্ষণটুকু থাকিলে, এক দিন না এক দিন, তাঁর সহিত যুক্ত হইবেই হইবে। ঐ আকর্ষণটুকু না থাকিলে প্রাণ ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া কেবল দল বাঁধিতে অগ্রসর হইবে, উপাসনা কেবল বাক্যাড়ম্বরে পরিণত হইবে, কর্ম্মসকল যশোলিপ্সার ফল হইয়া দাঁড়াইবে।

পরমেশ্বর স্বয়ং মানবের প্রাণে এই আকর্ষণ দিয়াছেন। এই আকর্ষণ অন্যপদার্থে ধাবিত না হইলেই, আপনাআপনি তাঁহার দিকে যাইবে, তখন অন্য পদার্থসকলও তাহার সহায়তা করিবে। গঙ্গার স্রোত প্রবলবেগে সমুদ্রে গমন করে। সেই গঙ্গার স্রোত যদি সমুদ্রের দিকে না যাইয়া, তাহার উপনদী সমূহে প্রবিষ্ট হইত, তবে শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া পড়িত;

কিন্তু সমুদ্রের দিকে যাওয়াতে, উপনদীসমূহের স্রোত অধিকতর বেগবতী হইয়া চলিতেছে, পর্ব্বতাদি নানা পদার্থ ভেদ করিয়া যাইতেছে। সেইরূপ মানবের প্রাণও যদি পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত না হইয়া স্ত্রী পুত্রাদিতে ধাবিত হয়, তখন তাহার প্রাণ শুষ্ক হইয়া পড়ে, কিন্তু যখনই তাহার হৃদয় ভগবানের দিকে চলিতে থাকে, তখন স্ত্রীপুত্রসকল তাহার সহায়তা করিয়া তাহাকে অধিকতর বেগশালী করিয়া তাঁহার দিকে লইয়া যায়। তখন সে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

---

(২৮)

আমারদের নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমারদের প্রিয়তমের পূজার সঙ্গে বাহ্য আড়ম্বরের কোন যোগ নাই। আমরা অন্তরেই সেই অন্তরতর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। যখন অদ্য এখান হইতে তোমার-দিগকে পুনর্ব্বার বলি যে, শান্ত দান্ত উপরত সমাহিত হইয়া প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অন্তরে দেখ, তখন তাহা আর তোমারদের তত কষ্ট-সাধ্য বোধ হয় না। নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজে চলিতেছে, ঈশ্বরও সেইপ্রকার আমার-দের অন্তরে আসিয়া মুহুর্মুহুঃ সাক্ষাৎ দিতেছেন, আবার সেখান হইতে তাঁহার শুভ্র জ্যোতি পৃথিবীতে বিকীর্ণ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। একবার নিমীলিত নয়নে আত্মার নিভৃত নিলয়ে, সুরম্য নিকেতনে, প্রিয়তমের দর্শন পাইতেছি—আবার পরক্ষণে নেত্র উন্মীলন করিয়া এই জগতীতলে তাঁহার মঙ্গল কিরণ

বিকীর্ণ দেখিতেছি। শরীরের যে উত্তাপ ও সেই উত্তাপের সাধন যে অনল, জল, বায়ু, তাহার সঙ্গে আত্মার অতি অস্থায়ী সম্বন্ধ। আকাশ, যাহা শরীরের অবলম্বন, যাহা সমুদায় জগতের অবলম্বন, তার সঙ্গে আত্মার তো কিছুই যোগ নাই। আত্মার যোগ পরমাত্মারই সঙ্গে; আত্মার পরমাকাশ সেই পরমেশ্বর। ফল যেমন বৃক্ষের বৃন্তকে অবলম্বন করিয়া আছে—জড় যেমন আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে, আত্মা সেইরূপ পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আলম্বিত রহিয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

---

(২৯)

বাস্তবিক পৃথিবীর কল্যাণের জন্য যদি কেহ বৈরাগী হইয়া থাকেন তো তিনি মহাদেব। মহাদেব কেবল অষ্টপ্রহর বলিতেছেন, জীব, তোদের কল্যাণ হোক্। ছেলে হবে সুখী, এই জন্য পিতা হলেন ভিখারী। তিনি তো সর্ব্ব-ত্যাগী, আবার আপনাকেও ত্যাগ করিলেন। ভক্তকে বলিলেন "তুই কি মনে করেছিস্ আমি আমার ভক্তকে কেবলই বিশ্ব দিই। আমিও যে ভক্তেরই। আমার টাকাকড়ি সমুদায় আমার ভক্তেরই উপর লিখিয়া দিই। সমস্ত দিলাম। কেবল শেষে বাকি রহিলাম আমি, আমাকেও তুই নে। তোর কাছে থাকিব আমি। তোর কাছে সেবকের মত দিনরাত্রি হাজির রহিলাম। যখন "আমার মহাদেব কৈ ?" বলিয়া ডাকবি তখনই তোর কাছে আসব। আমি মেঘকে বলেছি, আমার ভক্তের ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিতে ; ফলকে বলেছি,

ভক্তের গলায় মালা হ'য়ে ঝুলিতে ; চাঁদকে বলেছি, ভক্তের মাথায় সুন্দর জ্যোৎস্না দিতে ; আর সূর্য্যকে বলেছি, ভক্তের ঘরে আলো দিতে। ভক্ত আমার বড় আদরের ধন।" এক দিকে সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্ম, আর এক দিকে প্রকৃতির সমস্ত ধন ও রত্ন। আহা দেখ দেখ, আমরা যে শ্মশান দেখিয়া ভয় পাইতাম, তাহারই ভিতর কেমন লাবণ্য, কেমন সৌন্দর্য্য ! বৈরাগ্য হাসেন প্রকৃতির মুখ দেখে, আর প্রকৃতি হাসেন মহাদেবের মুখপানে চেয়ে !

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

(৩০)

একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক্ 'দাস আমি' হয়ে। হে ঈশ্বর, তুমি প্রভু, আমি দাস,এই ভাবে থাকো। আমি দাস, আমি ভক্ত, এরূপ 'আমিতে' দোষ নেই; মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়।

যেমন জলের রাশির উপর বাঁশ না রেখে একটি রেখা কাটা হয়েছে। যেন দুই ভাগ জল। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। দাস আমি কি ভক্ত আমি কি বালকের আমি, এরা যেন আমির রেখা মাত্র।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

---

(৩১)

বিষয় যাহাদের লক্ষ্য, ঈশ্বর তাহারদের উপায়। তাহারা ঈশ্বরকে আপনার মনের মত কল্পনা করিয়া লয়। তাহারদের ঈশ্বর পক্ষপাতী। তাহারা তাঁহার নিকট হইতে অজস্র বিষয়সুখই প্রার্থনা করে – ঈশ্বরকে বিষয়সুখ লাভের উপায় করে। "দর্শন দেও হে কাতরে, দীন হীন আমি" "ধন মান চাহি না, তোমা হ'তে, দেও এই অধিকার, নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি"—এই আন্তরিক প্রার্থনা যখন পূর্ণ হয়, তখন ভক্তের হৃদয়হইতে কৃতজ্ঞতা-সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে ধাবিত হয়।

যেমন তাঁর বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়—যেমন তিনি সন্তোষামৃত লাভ করেন—যেমন তাঁহার সুপ্রশস্ত প্রসন্ন আত্মাতে ঈশ্বরকে বিরাজিত দেখেন; তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ব্যক্ত করেন, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্য তোমার দয়া

জগদীশ! আশ্চর্য্য তোমার করুণা আমি কে যে তুমি আমাকে দেখা দিতেছ!" তিনি কৃতজ্ঞতা কোথায় রাখিবেন, কি প্রকারে ব্যক্ত করিবেন, তাহা তিনিও জানেন না। তাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয় ঈশ্বরের সত্তাতে পূর্ণ হইল— তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির পান না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

(৩২)

উপনিষদ মধ্যে দুই সুন্দর পক্ষীর কথা বোধ হয় অনেকে শুনিয়াছেন। এক পক্ষী ফলভোগ করে, অপর পক্ষী ফলপ্রদাতা। হে বিশ্বাসী, তোমার এই দেহমধ্যে দুইটি পাখী একত্র সুখে বাস করে। প্রত্যেক নরদেহে, প্রত্যেক নারীদেহে দুই আত্মা বাস করিতেছে। হে মানব, তুমি যাহাকে আমি বলিতেছ এই আমিকে কাটিলে দুইটি সুন্দর পক্ষী বাহির হইবে; একটি তুমি, অপরটি তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক স্বয়ং ঈশ্বর। এক আমির ভিতরে দুই অতীন্দ্রিয় আত্মা। এক আধারে দুই অদৃশ্য আধেয়। যখনই তুমি তোমার দেহবৃক্ষে জীবাত্মাকে দেখিবে, তখনই তুমি তাহার অব্যবহিত পার্শ্বে পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। পরমাত্মা চিরকাল অনশন-ব্রতধারী তিনি আহার করেন না, তিনি মহাযোগী চিরনিস্তব্ধ নিত্যধ্যানশীল; তাঁহার আলস্য নাই, তিনি

নিদ্রা যান না ; অনন্ত কালের পক্ষী, স্রষ্টা পক্ষীর কোন প্রকার ভোগবাসনা নাই, তিনি চির বৈরাগী, পরম বৈরাগী ; কিন্তু সৃষ্ট পক্ষী, স্রষ্টা পক্ষী হইতে নানা প্রকার ফল এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীসকল লাভ করিতেছে, সে সকল ভোগ করিতেছে, ক্ষুদ্র সৃষ্ট পক্ষী কখনও মনের আনন্দে স্রষ্টা পক্ষীর গুণকীর্ত্তন করিতেছে, কখনও অলস হইতেছে ; কখনও জাগ্রৎভাবে ব্রহ্মধ্যান করিতেছে, কখনও নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িতেছে।

আমি দুই, আমার এই দেহ বৃক্ষে আমি একাকী বাস করিতেছি না ; কিন্তু আমি এবং আমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক একত্র বাস করিতেছি, বারম্বার স্মৃতি ও চিন্তা দ্বারা এই নবজীবনপ্রদ সত্য অন্তরে আয়ত্ত কর এবং বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ইহা জীবনে পরিণত কর। কি শারীরিক, কি মানসিক প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিবে। যখন

তুমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং আস্বাদন কর, তখন তুমি তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-শক্তির মূলে ঈশ্বরের শক্তি উপলব্ধি করিবে, এবং যখন তুমি তোমার মনের শক্তি-সকল পরিচালন কর, তন্মধ্যেও তুমি ঈশ্বরের শক্তি দেখিবে। এইরূপে দেখিবে তুমি এবং তোমার স্রষ্টা দেহবৃক্ষ মধ্যে দুশ্ছেদ্য যোগশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছ। এইরূপে দুটি পক্ষীর পরস্পরের সখ্যভাব বৃদ্ধি হইতেছে। যখন দুই জনের সৌহার্দ্দ ঘনীভূত হয়, তখন জীবাত্মা পরমাত্মাকে বলেন, "পরমাত্মন্, আর যে তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না। পরমাত্মা জীবাত্মাকে বলেন "হে ক্ষুদ্র জীবাত্মা, তুমি আমাকে এত ভালবাস যে তুমি আমা ছাড়া আর কাহাকেও জান না, অতএব আমিও তোমাকে নিত্য আমার চক্ষের ভিতরে রাখিব।" এইরূপে দিন দিন

বৎসরে বৎসরে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ বাড়িতে থাকে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

---

(৩৩)

হে পরমাত্মন্! আমরা উন্নত হইয়া তোমার নিকট আগমন করি নাই, নত হইয়াই তোমার নিকটে আসিয়াছি যে, তুমি উন্নত করিবে। আমরা পুণ্যবান্ হইয়া তোমার নিকট আগমন করি নাই, পাপী হইয়াই আসিয়াছি যে, তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবে—অজ্ঞান ও দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিবে। দুঃখী হইয়াই তোমার আশ্রয় লইয়াছি যে, দুঃখ দুর্দ্দিনের অবসান হইবে—আমরা সম্পদে স্ফীত হইয়া তোমার নিকট আগমন করি নাই। আমরা কুৎসিত ও মলিন হইয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি যে, তুমি সেই মলিনতা পরিহার করিয়া হৃদয়কে সৌন্দর্য্যে ও সাধুভাবে পূর্ণ করিবে। অসৎ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি যে, তুমি সৎ পদবীতে লইয়া যাইবে, অন্ধকারে ভীত হইয়া তোমাকে অনুসন্ধান করিতেছি যে, তুমি

স্বপ্রকাশ আলোকে লইয়া যাইবে; মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি যে, তুমি অমৃতস্বরূপে লইয়া যাইবে। আমারদের সকলি দুর্গতি সকলি দুর্দ্দশা—কেবল তুমি একমাত্র আমারদের সম্পদ। তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া সৎকে—জ্যোতিকে অমৃতকে প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি হৃদয়ে যে বিশ্বাস দিয়াছ, তাহা কখনই ব্যর্থ যাইবে না; আমরা নিশ্চয় জানিতেছি। হে পরমাত্মন, অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিস্বরূপে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

শান্তিনিকেতন

(পঞ্চদশ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস,—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসুর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র

শান্তিনিকেতন

পিতার বোধ

যা প্রাণের জিনিষ তাকে প্রথার জিনিস করে তোলার যে কত বড় লোকসান সে কথা ত প্রতিদিন মনে পড়ে না। কিন্তু আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে ত ফাঁকি দিয়ে সারিনে; অন্ন-জলকে ত সত্যকারই অন্নজলের মত ব্যবহার করে থাকি; কেবল আমার ভিতরকার এই যে মানুষটি, ধনে যাকে ধনী করে না, খ্যাতি-প্রতিপত্তি যার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে না, সংসারের ছায়ারৌদ্রপাতে যার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না—সেই আমার অন্তরতম

চিরকালের মানুষটিকে দিনের পর দিন বস্তু না দিয়ে কেবল নাম দিয়ে বঞ্চনা করি, তাকে আমার মন না দিয়ে কেবল মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে থাকি। সে যা চায় তা নাকি সকলের চেয়ে বড়, এই জন্যে সকলের চেয়ে শূন্য দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখে অন্য সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই।

আমাদের এই বাইরের মানুষের, এই সংসারের মানুষের সঙ্গে সেই আমাদের অন্তরের মানুষের একটা মস্ত তফাৎ হচ্চে এই যে, এই বাইরের লোকটাকে আমরা আদর করে বা অবজ্ঞা করে উপহারই দিই আর ভিক্ষাই দিই না কেন সে সেটা পায়—আর সত্যকার ইচ্ছার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যা না দিই সে আমার সেই অন্তরের মানুষটির কাছে গিয়েও পৌঁছে না।

সেই জন্যে দানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে, "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্"—শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। কেন না, মানুষের বাহিরে ভিতরে দুই বিভাগ আছে,

একটা বিভাগে অর্থ এসে পড়ে আর একটা বিভাগে শ্রদ্ধা গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্য শ্রদ্ধা যদি না দিই, শুধু টাকাই দিই তাহলে মানুষের অন্তরাত্মাকে কিছুই দেওয়া হয় না, এমন কি, তাকে অপমানই করা হয়। তেমন দান কখনই সম্পূর্ণ দান নয়—সুতরাং সে দান সংসারের দান হতে পারে কিন্তু সে দান ধর্ম্মের দান হতেই পারে না। দান যে আমরা কেবল পরকেই দিয়ে থাকি তা ত নয়।

বস্তুত, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করচি—সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করচি—সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি দান যখনি বন্ধ হয়ে যাবে তখনি প্রাণের আগুন আর জ্বলবে না, জীবনের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে। এই রকম

মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এইজন্যে নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখতে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে আপনার একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারচি ততই দান করচি। সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরেই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা।

বাতি, আপনাকে আপনি যে পরিমাণে দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাকবে। নিজের প্রকাশযজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

সে দান ত আমাদের চলচেই, কিন্তু কি দান করচি এবং সেটা পৌঁচচ্ছে কোন্‌খানে সে ত আমাদের দেখতে হবে। সারাদিন খেটেখুটে বাইরের জিনিস কুড়িয়েবাড়িয়ে যা

কিছু পাচ্চি সে আমরা কার হাতে এনে জমা করচি? সে ত সমস্তই দেখচি বাইরেই এসে জমচে। টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সে ত এই বাইরের মানুষের।

কিন্তু নিজেকে এই যে আমরা দান করচি, এই যে আমার চেষ্টা, এই যে আমার সমস্তই. —এ কি পূর্ণদান হচ্চে, শ্রদ্ধার দান হচ্চে, ধর্ম্মের দান হচ্চে? এতে করে আমরা বাড়াচ্চি কিন্তু বড় হতে পারচি কি? এতে করে আমরা সুখ পাচ্চি কিন্তু আনন্দ পাচ্চিনে; এতে করে ত আমাদের প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পারচে না। মানুষ বল্লে যতখানি বোঝায় ততখানি ত ব্যক্ত হয়ে উঠচে না।

কেন এমন হচ্চে? কেন না এই দানে মস্ত একটা অশ্রদ্ধা আছে। এই দানের দ্বারা আমরা নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধা করে চলেছি। আমরা নিজের কাছে যে অর্ঘ্য বহন করে আনচি তার দ্বারাই আমরা স্বীকার করচি যে,

আমার মধ্যে বরণীয় কিছুই নেই। আমাদের যে আত্মপূজা, সে একেবারেই দেবতার পূজা নয়, সে অপদেবতার পূজা—সে অত্যন্ত অবজ্ঞার পূজা। আমাদের যা অপবিত্র তাই দিয়েও আমরা নৈবেদ্যকে ভরিয়ে তুলচি।

নিজেকে যে লোক কেবলি ধন মান জোগাচ্চে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলই অবিশ্বাস করচে সে আপনার অন্তরের মানুষকে কেবলি অপমান করচে; তাকে সে কিছুই দিচ্চে না, কিছু দেবার যোগ্যই মনে করচে না। এমনি করে সে নিজেকে কেবল অর্থই দিচ্চে কিন্তু শ্রদ্ধা দিচ্চে না—এবং শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ এই উপদেশবাণীটিকে সকলের চেয়ে ব্যর্থ করচে নিজের বেলাতেই।

কিন্তু সত্যকে আমরা হাজার অস্বীকার করলেও সত্যকে ত আমরা বিনাশ করতে পারিনে। আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটিকে আমরা যে চিরদিনই কেবল অভুক্ত রেখে

দিচ্চি, তার দুর্গতি ত কোনো আরামে কোনো আড়ম্বরে চাপা পড়ে না। আমরা যার সেবা করি সে ত আমাদের বাঁচায় না, আমরা যার ভোগের সামগ্রী জুগিয়ে চলি সে ত আমাদের এমন একটি কড়িও ফিরিয়ে দেয় না যাকে আমাদের চিরানন্দপথের সম্বল বলে বুকের কাছে যত্ন করে জমিয়ে রেখে দিতে পারি। আরামের পর্দ্দা ছিন্ন করে ফেলে দুঃখের দিন ত বিনা আহ্বানে আমাদের সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, তখন ত বুকের রক্ত দিয়েও তার দাবি নিঃশেষে চুকিয়ে মিটিয়ে দিতে পারি নে; আর অকস্মাৎ বজ্রের মত মৃত্যু এসে আমাদের সংসারের মর্ম্মস্থানের মাঝখানটায় যখন মস্ত একটা ফাঁক রেখে দিয়ে যায় তখন রাশি রাশি ধনজনমান দিয়ে ফাঁক ত কিছুতে ভরিয়ে তুলতে পারিনে। যখন একদিকে ভার চাপতে চাপতে জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে

প্রবৃত্তির ঠেকাঠেকি হতে থাকে অবশেষে ভিতরে ভিতরে পাপের উত্তাপ বাড়াতে বাড়তে একদিন যখন বিনাশের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন লোকজন সৈন্য-সামন্ত কাকে ডাকব, যে তার উপরে এক ঘড়াও জল ঢেলে দিতে পারে। মূঢ়, কাকে প্রবল করে তুমি বলী হলে, কাকে ধনদান করে তুমি ধনী হতে পারলে, কাকে প্রতিদিন রক্ষা করে করে তুমি চিরদিনের মত বেঁচে গেলে ?

আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি কোন্ আশ্রয়ের জন্যে পথ চেয়ে আছে ? আমরা এতদিন ধরে তাকে কোন ভরসা দিয়ে এলুম ? বাহিরের বৈঠকখানায় আমরা ঝাড় লণ্ঠন খাটিয়ে দিলুম কিন্তু অন্তরের ঘরের কোণটিতে আমরা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালালুম না। রাত্রি গভীর হল, অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল, সেই তার একলা ঘরের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে

ধূলায় বসে সে যখন কেঁদে উঠল আমরা তখন প্রহরে প্রহরে কি বলে তাকে আশ্বাস দিলুম ?

তার সেই মর্ম্মভেদী রোদনে আমাদের নিশীথরাত্রির প্রমোদসভায় যখন ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বড়ই ব্যাঘাত করতে লাগল, আমোদের মত্ততার মাঝখানে তার সেই গভীর ক্রন্দন আমাদের নেশাকে যখন ক্ষণে ক্ষণে ছুটিয়ে দেবার উপক্রম করলে তখন আমরা তাকে কোনোমতে থামিয়ে রাখবার জন্যে তার দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাকে বলে এসেছি, ভয় নেই তোমার, "আমি আছি।" মনে করেছি, এই বুঝি তার সকলের চেয়ে বড় অভয় মন্ত্র যে, "আমি আছি।" নিজের সমস্ত ধনসম্পদ মানমর্য্যাদাকে একটা মমতার সূত্রে জপমালার মত গেঁথে ফেলে তার হাতে দিয়ে বলেছি, এইটেকেই তুমি দিনরাত্রি বারবার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবলি একমনে

জপ করতে থাক আমি, আমি, আমি। আমি সত্য, আমি বড়, আমি প্রিয়।

তাই নিয়ে সে জপচে বটে, আমি, আমি, আমি, কিন্তু তার চোখ দিয়ে জলপড়া আর কিছুতেই থামচে না। তার ভিতরকার এ কোন্ একটা মহাবিষাদ অশ্রুবিন্দুর গুটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জপে যাচ্চে, না, না, না, নয়, নয়, নয়। কোন্ তাপসিনীর করুণবীণায় এমন উদাসকরা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তুলচে—ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হলরে —সকালবেলাকার আলোক ব্যর্থ হল, রাত্রি বেলাকার স্তব্ধতা ব্যর্থ হল—মায়াকে খুঁজলুম, ছায়াকে পেলুম, কোথাও কিছুই ধরা দিল না।

ওরে মত্ত, কোন মাভৈঃ বাণীটির জন্যে আমার এই অন্তরের একলা মানুষ এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে কান পেতে রয়েছে? সে হচ্চে চিরদিনের সেই সত্য বাণী, পিতা নোঽসি—পিতা তুমিই আছ।

তুমি আছ পিতা, তুমি আছ—আমাদের পিতা তুমি আছ—এই বাণীতেই সমস্ত শূন্য ভরে গেল, সমস্ত ভার সরে গেল, কোনো ভয় আর কোথাও রইল না।

আর ওটা কি ভয়ানক মিথ্যা—ঐ যে "আমি আছি।" কে আছ, তুমি আছ কোথায়? তুমি ভবসমুদ্রের কোন্ ফেনা-গুলাকে আশ্রয় করে বলচ "আমি আছি।" যে বুদ্বুদটি যখনি ফেটে যাচ্চে তাতে তখনি তোমারই ক্ষয় হয়ে যাচ্চে, সংসারে দীর্ঘনিশ্বাসের যে লেশমাত্র তপ্ত হাওয়াটুকু তোমার গায়ে এসে লাগচে তাতে একেবারে তোমার সত্তাকেই গিয়ে ঘা দিচ্চে। তুমি আছ কিসের উপরে? তুমি কে? অথচ আমার অন্তরের মানুষ যখন বলচে "চাই" তখন তুমি অহঙ্কার করে তাকে গিয়ে বলচ, আমি আছি, তুমি আমাকেই চাও, তুমি আমাকে নিয়েই খুসি থাক। এ তোমার কেমন দান! তোমার প্রকাণ্ড

বোঝা বইবে কে? এ যে বিষম ভার! এ যে কেবলি বস্তুর পরে বস্তু, কেবলি ক্ষুধার পরে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ! এ ত তোমাকে আশ্রয় করা নয়, এ যে তোমাকে বহন করা। তুমি যে পঙ্গু, তোমার যে পা নেই, তুমি যে কেবলি অন্যের উপরেই ভর দিয়ে সংসারে চলে বেড়াও! তোমার এ বোঝা যেখানকার সেইখানেই পড়ে পড়ে ধূলোর সঙ্গে ধূলো হয়ে যেতে থাক! যে মানুষটি যাত্রী, যে পথের পথিক, অনন্তের অভিমুখে যার ডাক আছে, সে তোমার এই ভার টেনে টেনে বেড়াবে কেন? এই সমস্ত বোঝার উপর দিনরাত্রি বুক দিয়ে চেপে পড়ে থাকবে, সে সময় তার কোথায়? এই জন্যে সে তাঁকেই চায় যাঁর উপরে সে ভর দিতে পারবে, যাঁর ভার তাকে বইতে হবে না। তুমি কি সেই নির্ভর নাকি? তবে কি ভরসা দেবার জন্যে তুমি তার কানের কাছে এসে মন্ত্র জপচ—"আমি আছি!"

পিতা নোঽসি –পিতা তুমি আছ, তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। "সত্যং" এই বলে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন—সে কথাটির মানে হচ্চে এই যে, পিতানোঽসি, পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।

কিন্তু তুমি আছ এই বোধটিকেত সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে! তুমি আছ—এ ত শুধু একটা মন্ত্র নয়—তুমি আছ, এটা ত শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। "তুমি আছ" এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে না যেতে পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম– কেনই বা কিছু দিনের জন্য নানা জিনিষ আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালুম—শেষ কালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল?

শক্ত হয়েছে এই যে, আমি আছি এই বোধটিকেই আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস করে ফেলেছি। জীবনের সকল চেষ্টাতেই কেবল এই আমিকেই নানা রকম করে স্বীকার করে এসেছি, প্রতিদিনের সমস্ত খাজনা তারই হাতে শেষ কড়াটি পর্যান্ত জমা করে দিয়েছি। আমি বোধটা একেবারে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে, সে যদি বড় দুঃখ দেয় তবু তাকে অন্যমনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুলতে ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারিনে!

সেই জন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও। পিতা নো বোধি—পিতার বোধ দিয়ে আমার সমস্তকে সমস্তটা ভরে তোলো, কিছুই আর বাকি না থাক; আমার প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস পিতার বোধ নিয়ে আমার সর্ব্বশরীরে

প্রাণের আনন্দ তরঙ্গিত করে তুলুক, আমার সর্বাঙ্গের স্পর্শ চেতনা পিতার বোধ পুলকিত হয়ে উঠুক, পিতার বোধের আলোক আমার দুই চক্ষুকে অভিষিক্ত করে দিক। পিতা নো .বাধি—আমার জীবনের সমস্ত সুখকে পিতার বোধে বিনম্র করে দিক—আমার জীবনের সমস্ত দুঃখকে পিতার বোধ করুণাবর্ষণে সফল করে তুলুক। আমার ব্যথা, আমার লজ্জা, আমার দৈন্য, সকলের সঙ্গে আমার সমস্ত বিরোধ, পিতার বোধের অসীমতার মধ্যে একেবারে ভাসিয়ে দিই। এই বোধ প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাক—নিকট হতে দূরে দূর হতে দূরান্তরে—আত্মীয় হতে পরে, মিত্র হতে শত্রুতে, সম্পদ হতে বিপদে, জীবন হতে মৃত্যুতে—প্রসারিত হতে থাক—প্রিয় হতে অপ্রিয়ে, লাভ হতে ত্যাগে, আমার ইচ্ছা হতে তোমার ইচ্ছায়।

প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে গিয়েছি, পিতা নো

বোধি, কিন্তু একবারও মনেও আনিনি কত বড় চাওয়া চাচ্চি—মনেও আনিনি এই প্রার্থনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের সাধনাকে কত বড় সাধনা করতে হবে। কত ত্যাগ, কত ক্ষমা, কত পাপের ক্ষালন, কত সংস্কারের আবরণ মোচন, কত হৃদয়ের গ্রন্থি-ছেদন—জীবনকে সত্য করতে না পারলে সেই অনন্ত সত্যের বোধকে পাব কেমন করে, নিজের নিষ্ঠুর স্বার্থকে ত্যাগ করতে না পারলে সেই অনন্ত করুণার বোধকে গ্রহণ করব কেমন করে? সত্যে মঙ্গলে দয়ায় সৌন্দর্য্যে আনন্দে নির্ম্মলতায় ভরে রয়েছে, সমস্ত ঘন হয়ে ভরে রয়েছে—সেই ত আমার পিতা, সর্ব্বত্র আমার পিতা। পিতা নোঽসি, পিতা নোঽসি—এই মন্ত্রের অক্ষরই সমস্ত আকাশে, এই মন্ত্রের ধ্বনিই জ্যোতির্ম্ময় সুরসপ্তকের বিশ্বসঙ্গীত; পিতা তুমি আছ এই মন্ত্রই কত অসংখ্য-রূপ ধরে লোকলোকান্তরে সমস্ত জীবকে

কোলে করে নিয়ে সুখদুঃখের অবিরাম বৈচিত্র্যে সৃষ্টিকে প্রাণপরিপূর্ণ করে রয়েছে। অসীম চেতন-জগতের মধ্যে নিয়ত উদ্বেলিত তোমার যে পিতার আনন্দ—যে আনন্দে তুমি আপনাকেই আপন সন্তানের মধ্যে নিরীক্ষণ করে লীলা করচ ;—যে আনন্দে তুমি তোমার সন্তানের মধ্যে ছোট হয়ে নত হয়ে আসচ এবং তোমার সন্তানকে তোমার মধ্যে বড় করে তুলে নিচ্চ—সেই তোমার অপরিসীম পিতার আনন্দকেই সকলের চেয়ে সত্য করে আপনার সকলের চেয়ে পরম সম্পদ করে বোধ করতে চাচ্চে আমার অন্তরাত্মা—তবু সেই জায়গায় আমি কেবলি তার কাছে এনে দিচ্চি আমার অহংকে। সেই অহংকে কিছুতেই আমি তাড়াতে পারচি নে, তার কাছে আমার নিজের জোর আর কিছুতেই খাটে না, অনেক দিন হল তার হাতেই আমার সমস্ত কেল্লা আমি ছেড়ে দিয়ে বসে আছি ; আমার সমস্ত অস্ত্র

সেই নিয়েছে, আমার সমস্ত ধনের সেই অধিকারী। সেই জন্তেই তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা—পিতা নো বোধি—পিতা, এই বোধ তুমিই আমার মনে জাগাও! এই বোধটিকে একেবারে বাধাহীন করে লাভ করি যে, আমার অস্তিত্ব এ কেবলমাত্রই সন্তানের অস্তিত্ব;—আমি ত আর কারো নই, আর কিছুই নই, তোমার সন্তান এই আমার একটি-মাত্র সত্য; এই সন্তানের অস্তিত্বকে ঘিরে ঘিরে অন্তরে বাহিরে যা কিছু আছে, এ সমস্তই পিতার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়:—এই জল স্থল-আকাশ, এই জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্য, এই সুখদুঃখের সংসারলীলা, এ সমস্তই সন্তানের জীবনকে আলিঙ্গন করে ধরচে। এইবার কেবল আমার দিকের দরকার আমার সমস্ত প্রাণটা পিতা বলে সাড়া দিয়ে উঠুক। উপরের ডাকের সঙ্গে নীচের ডাকটি মিলে যাক—আমার দিক থেকে কেবল এইটেই বাকি আছে।

তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভরে উঠল—তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না—পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ একেবারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্চে—কিন্তু তোমার এই এত বড় আকাশভরা আত্মদান আমরা দেখতেই পাচ্চিনে, গ্রহণ করতেই পারচিনে—কিসের জন্যে ? ঐ এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলচে, আমি! একবার একটুখানি থাম ! একবার আমার জীবনের সব চেয়ে সত্য বলাটা বলতে দে, একবার সন্তান-জন্মের চরম ডাকটা ডাকতে দে—পিতা নোঽসি ! পিতা পিতা, পিতা,—তুমি, তুমি, তুমি, কেবল এই কথাটা,—অন্ধকারে আলোতে নির্ভয়ে গলা খুলে কেবল—আছ, আছ, আছ। 'আমি' তার সমস্ত বোঝাসুদ্ধ একেবারে তলিয়ে যাক সেই অতলস্পর্শ সত্যে যেখানে তুমি তোমার সন্তানকে আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে আবৃত

করে জানচ; তেমনি করে সন্তানকেও জানতে দাও তার পিতাকে। তোমার জানা এবং তার জানার মাঝখানকার বাধাটা একেবারে ঘুচে যাক—তুমি যেমন করে আপনাকে দান করেচ তেমনি করে আমাকে গ্রহণ কর।

নমস্তেঽস্তু—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি! এই আমার পিতার বোধ যখন জাগে তখন নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সর্ব্বত্র যখন পিতাকে পাই তখন সর্ব্বত্র হৃদয় আনন্দে অবনত হয়ে পড়ে। তখন শুনতে পাই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম মর্ম্মকুহর হতে একটিমাত্র ধ্বনি অনন্তের মধ্যে নিশ্বসিত হয়ে উঠচে—নমোনমঃ। লোকে লোকান্তরে, নমোনমঃ। সুমধুর সুগম্ভীর নমোনমঃ। তখন দেখতে পাই নমস্কারে নমস্কারে নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র একটিমাত্র জায়গায় তাদের জ্যোতির্ম্ময় ললাটকে মিলিত করেছে। সমস্ত বিশ্বের এই আশ্চর্য্য

সুন্দর সামঞ্জস্য—যে সামঞ্জস্য কোথাও কিছুমাত্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা সৃষ্টির বিচিত্র ছন্দকে একটুও আঘাত করচে না, আপনার অণুতে পরমাণুতে অনন্তের আনন্দকে সম্পূর্ণ মেনে নিচ্চে—এই ত সেই নমস্কারের সঙ্গীত—ঊর্দ্ধে অধোতে দিকে দিগন্তরে নমোনমঃ। এই সমস্ত বিশ্বের নমস্কারের সঙ্গে আমার চিত্ত যখন তার নমস্কারটিকেও এক করে দেয়, সে যখন আর পৃথক্ থাকতে পারে না—তখন সে চিরকালের মত ধন্য হয়—তখনই সে বুঝতে পারে, আমি বেঁচে গেলুম আমি রক্ষা পেলুম—তখনই জগতের সমস্তের মধ্যেই সে আপনার পিতাকে পেলে—কোনো জায়গায় তার আর কোনো ভয় রইল না।

পিতা, নমস্তেঽস্তু—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই পারাই চরম পারা—এই পারাতেই জীবনের সকল পারা শেষ হয়ে যায়। যেন নমস্কার করতে পারি! সমস্ত যাত্রার

অবসানে নদী যেমন আপনাকে দিয়ে সমুদ্রকে এসে নমস্কার করে, সেই নমস্কারটিতেই তার সমস্ত পথযাত্রা একেবারে নিঃশেষে সার্থক—হে পিতা তেমনি করে একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে তোমার মধ্যে আপনাকে যেন শেষ করে দিতে পারি। এই যে আমার বাহিরের মানুষটা, এই আমার সংসারের মানুষটা, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানকার অতি ক্ষুদ্র এই মানুষটা—এ কেবল মাথাটাকে সকলের চেয়ে উঁচুতে তুলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে চায়। সকলের চেয়ে আমি তফাৎ থাকব, সকলের চেয়ে আমি বড় হব—এতেই তার সকলের চেয়ে সুখ। তার একমাত্র কারণ এই, আপনার মধ্যে তার আপনার স্থিতি নেই। বাইরের বিষয়ের উপরেই তার স্থিতি—যত জিনিস বাড়ে ততই সে বাড়ে, নিজের মধ্যে সে শূন্য, সেখানে তার কোনো সম্পদ নেই এইজন্য বাইরে ধন যত জমে ততই সে ধনী হয়। জিনিসপত্র নিয়েই

যাকে বড় হতে হয় সে ত সকলের সঙ্গে মিলতে পারে না ;—জিনিসপত্র ত জ্ঞান নয়, প্রেম নয়—সকলকে দান করার দ্বারাই ত সে আরো বাড়ে না, ভাগ করার দ্বারাই ত সে আরো ঘনীভূত হয়ে উঠে না—তার থেকে যা যায়, তা যায়, সে ত আরো দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে না—তার যা আমার তা আমার, যা অন্যের তা অন্যেরই—এই জন্যে যে মানুষটা উপকরণ নিয়েই বড় হয়, সকলের থেকে তফাৎ হয়েই সে বড় হয় ;—আপনার সম্পদকে সকলের সঙ্গে মেলাতে গেলেই তার ক্ষতি হতে থাকে ; এইজন্যে যতই সে বড় হয় ততই তার আমিটাই উঁচু হয়ে উঠতে থাকে, ততই চারিদিকের সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে—এবং তার সমস্ত সুখই অহঙ্কারের রূপ ধারণ করে অন্য সকলকে অবনত করতে চায়। এমনি করে বিশ্বের সঙ্গে বিরোধের দ্বারাই সে যে দুঃসহ তাপের

সৃষ্টি করে সেইটেকেই সে আপনার প্রতাপ বলে গণ্য করে।

কিন্তু আমার অন্তরের নিত্য মানুষটি ত দিনরাত্রি মাথা উঁচু করে বেড়াতে চায় নি—সে নমস্কার করতেই চেয়েছিল। তার সমস্ত আনন্দ, নমস্কারের দ্বারা বিশ্বজগতে প্রবাহিত হয়ে যেতে চেয়েচে, নমস্কারের দ্বারা তার আত্ম-সমর্পণ পরিপূর্ণ হতে চায়। নমস্কারের দ্বারা সে আপনাকে সেই জায়গাতেই প্রসারিত করে যেখানে তুমি তোমার পা রেখেছ, যেখানে তোমার চরণাশ্রয় করে জগতের ছোট বড় সকলেই এক জায়গায় এসে মিলেছে—যেখানে দরিদ্রকে ধনী দ্বারের বাইরে দাঁড় করাতে পারে না, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দূরে সরিয়ে রেখে দিতে পারে না—সেই ত সকলের চেয়ে নীচের জায়গা, সেই ত সকলের চেয়ে প্রশস্ত জায়গা, সেই তোমার অনন্ত-প্রসারিত পাদপীঠ—আমার অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ নমস্কারের দ্বারা সেই সর্ব্ব-

জন-ভোগ্য মহাপুণ্যস্থানের অধিকারটি পেতে ব্যাকুল হয়ে আছে। যে স্থানটি নিয়ে রাজা তার কাছ থেকে খাজনা দাবি করবে না, পাশের মানুষ তার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে আসবে না, সত্য নমস্কারটিই যে স্থানের এক-মাত্র সত্য দলিল সেই সম্পত্তিই আমার অন্তরাত্মার পৈতৃক সম্পত্তি।

জল যখন তাপের দ্বারা হাল্কা হয়ে যায় তখনি সে বাষ্প হ'য়ে উপরে চড়তে থাকে। তখনি সে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক্ করে ফেলে—তখনি সে ব্যর্থ হয়ে স্ফীত হ'য়ে উড়ে বেড়ায়, তখনি সে আলোককে আবৃত করে। কিন্তু তৎ-সত্বেও, সকলেই জানে, জলের যথার্থ স্বধর্ম্মই হচ্চে সে আপনার সমতলতাকেই চায়। সেই সমতলতাকে চাওয়ার মধ্যেই তার নমস্কারের প্রার্থনা—সেই নমস্কারের দ্বারাই সে রসধারায় সকল দিকে প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর মাটিকে

সফলতায় অভিষিক্ত করে দেয়—তার সেই প্রণত সাষ্টাঙ্গ নমস্কারই সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ। যে লঘুবাষ্পরাশি পৃথক্ হয়ে উঁচুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় নীচেকার সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করতেই চায় না, তার গায়ে শুভক্ষণে যেই একটু রসের হাওয়া লাগে, যেই সে আপনার যথার্থ গৌরবে ভরে ওঠে, অমনি সে আপনাকে আর ধারণ করে রাখতে পারে না—নমস্কারে বিগলিত হয়ে সেই সর্ব্ব-জনের নিম্নক্ষেত্রে, সেই সকলের মাঝখানে এসে লুটিয়ে পড়তে থাকে। তখনি জলের সঙ্গে জল মিশে যায়, তখনি মিলনের স্রোত চারদিকে ছুটে বইতে থাকে, বর্ষণের সঙ্গীতে দশদিক মুখরিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক জলবিন্দু তখনি আপনাকে সত্যরূপে লাভ করে, আপনার ধর্ম্মে আপনি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তেমনি আমার অন্তরের মানুষটি অন্তরে অন্তরে আপনাকে বর্ষণ করতে, আপনাকে

সমর্পণ করতে চাচ্চে। এই তার যথার্থ ধর্ম্ম। সে অহঙ্কারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্চে,—পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তের সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্ম্মটিকে যে পর্য্যন্ত সে না পাচ্চে সেই পর্য্যন্তই তার যত কিছু দুঃখ, যত কিছু অপমান। এইজন্তেই সে প্রতিদিন জোড় হাত করে বলচে, নমস্তেঽস্তু —তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি।

তোমাকে নমস্কার করা, এ কথাটি সহজ কথা নয়; এ ত কেবল অভ্যস্ত ভাবে মাথা নীচু করা নয়! পিতানোঽসি—তুমি আমাদের সকলেরই পিতা, এই কথাটিকে ত সহজে বলতে পারলুম না। যখন ভেবে দেখি এই কথাটি বলবার পথ প্রতিদিনই সকল ব্যবহারেই কেমন করে অবরুদ্ধ করে ফেলচি তখন মনে ভয় হয়—মনে করি, সন্তানের নমস্কার বুঝি

এ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আর সম্পূর্ণ হতে পারল না, মানুষের জীবনে যে রস সকল রসের সার সেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধুরতম রসটি হৃদয়ের মধ্যে বুঝি কণামাত্রও জায়গা পেল না! কেমন করেই বা পাবে? শুষ্ক যে সে আপনার শুষ্কতা নিয়েই গর্ব্ব করে, ক্ষুদ্র যে সে যে আপনার ক্ষুদ্রতা নিয়েই উদ্ধত হয়ে ওঠে! স্বাতন্ত্র্যের সঙ্কীর্ণতাকে ত্যাগ করতে গেলে সে যে কেবলি মনে করে আমি আমার আত্মাকেই খর্ব্ব করলুম। সে যে নমস্কার করতে চাচ্চেই না। তার এমনি দুর্দ্দশা যে উপাসনার সময় যখন সে তোমার কাছে আসে তখনো সে আপনার অহংটাকেই এগিয়ে নিয়ে আসে। সংসারক্ষেত্রে যেখানে সমস্তই আত্মপর ও উচ্চনীচের দ্বারা আমরা সীমাচিহ্নিত করে রেখেছি, সেখানে সর্ব্বলোক-পিতা যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করবার ত জায়গাই পাইনে—তোমাকে সত্যকার নমস্কার

করতে গেলে সকল দিকেই নানা দেয়ালেই মাথা ঠেকে যায়—কিন্তু তোমার এই পূজার ক্ষেত্রে যেখানে কেবল ক্ষণকালের জন্যেই আমরা পরিচিত অপরিচিত, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, তোমারই নামে একত্র সমবেত হই, সেখানেও যে মুহূর্ত্তেই আমরা মুখে উচ্চারণ করচি, পিতানোঽসি, তুমি আমাদের সকলের পিতা, তুমিই আছ, তুমিই সত্য—সেই মুহূর্ত্তেই আমরা মনে মনে লোকের জাতি বিচার করচি, বিদ্যা বিচার করচি, সম্প্রদায় বিচার করচি—যখনি বলচি নমস্তেঽস্তু তখনি নমস্কারকে অন্তরে কলুষিত করচি, সকলের পিতা বলে যে অসঙ্কুচিত নমস্কার তোমাকেই দিতে এসেছি তার অধিকাংশই তোমার কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে আমার সমাজটারই পায়ের কাছে স্থাপন করচি! সংসারে আমার অহং নিজের জোরে স্পষ্ট করেই প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়; সেখানে তার নিজের পূর্ণ অধিকার

সম্বন্ধে নিজের কোনো সংশয় বা লজ্জা নেই; এখানে তোমার পূজার ক্ষেত্রে তার অনধিকারের বাধাকে এড়াবার জন্যে সে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে আসে—কিন্তু এখানে তার সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর স্পর্দ্ধা এই যে, ছদ্মবেশে তোমারি সে অংশী হতে চায়, তোমার নামের সঙ্গে সে নিজের নামকে জড়িত করে এবং তোমার পূজার মধ্যেও সে নিজের অপবিত্র হস্তকে প্রসারিত করতে কুণ্ঠিত হয় না!

এমনি করে কি চিরদিনই আমরা তোমার নমস্কারকেও সাম্প্রদায়িক সামাজিক প্রথার মধ্যে এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের মধ্যেই ঠেলে রেখে দেব? কিন্তু কেন? তার প্রয়োজন কি আছে! তোমাকে নমস্কার ত আমার টাকা নয় কড়ি নয়, ঘর নয় বাড়ি নয়। তোমাকে নমস্কার করে আমার বাইরের মানুষটি ত তার থলির মধ্যে কিছুই ভরতে পারে না। রাজাকে

নমস্কার করলে তার লাভ আছে, সমাজকে নমস্কার করলে তার সুবিধা আছে, প্রবলকে নমস্কার করলে তার সাংসারিক অনেক আপদ এড়ায়—কিন্তু সে যদি দলের দিকে সমাজের দিকে অনিমেষ নেত্র মেলেই থাকে তবে তোমাকে নমস্কার করার কথা উচ্চারণ করবারই বা তার লেশমাত্র প্রয়োজন কি আছে?

প্রয়োজন যে একমাত্র তারই যে আমার ভিতরের মানুষ—সে যে নিত্য মানুষ—সে ত সংসারের মানুষ নয়, সে ত সমাজের কাছ থেকে ছোট বড় কোনো উপাধি গ্রহণ করে সেই চিহ্নে আপনাকে চিহ্নিত করে না। তার চরম প্রয়োজন সকলের সঙ্গে আপনাকে এক করে জানা—তাহলেই সে আপনাকে সত্য জানতে পারে—সেই সত্য জানা থেকে বঞ্চিত হলেই সে মুহ্যমান হয়ে অপবিত্র হয়ে জগতে বাস করে;—আপনাকে সত্যরূপে জানবার জন্যেই, সমাজ সংস্কারের সঙ্কীর্ণ জালের মধ্যে

নিজেকে নিত্যকাল জড়িত করে রাখবার দীনতা হতে উদ্ধার পাবার জন্যেই, সে ডাক্‌চে, তার পিতাকে, সে ডাকচে নিখিল মানুষের পিতাকে—সেই তার পিতার বোধের মধ্যেই তার আপনার বোধ সত্য হবে, তার বিশ্বের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ হবে। এ ডাক সমাজের ডাক নয়, সম্প্রদায়ের ডাক নয়, এ ডাক অন্তরাত্মার ডাক ; এ ডাক কুলশীলের ডাক নয়, মানসম্ভ্রমের ডাক নয়, এ ডাক সন্তানের ডাক ;—এই একটি মাত্র ডাকেই সকল সন্তানের কণ্ঠ এক সুরে মেলে,—এই পিতানোঽসি। তাই এ ডাকের সঙ্গে কোনো অহঙ্কার কোনো সংস্কারকে মেলাতে গেলেই এই পরম সঙ্গীতকে একমুহূর্ত্তেই বেসুরো করা হবে—তাতে আত্মা পীড়িত হবে এবং হে পরমাত্মন্‌ তাতে তোমাকেই বেদনা দেওয়া হবে যে তুমি সকল সন্তানের ব্যথার ব্যথী।

তাই তোমার কাছে অন্তরের এই অন্তরতম

প্রার্থনা—যেন নত হই, নত হই! সেই নতি দীনতার নতি নয়, সে যে পরম পরিপূর্ণতার প্রণতি। তোমার কাছে সেই একান্ত নমস্কার আত্মসমর্পণের পরমৈশ্বর্য্য। আমাদের সেই নমস্কার সত্য হোক, সত্য হোক—অহং শান্ত হোক, অহঙ্কার ক্ষয় হোক, ভেদবুদ্ধি দূর হোক, পিতার বোধ পূর্ণ হোক এবং বিশ্বভুবনে সন্তানের প্রণামের সঙ্গে পিতার বিগলিত আনন্দধারা সম্মিলিত হোক! নমস্তেঽস্তু!

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
    একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।
ঘনশ্রাবণ মেঘের মত রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন থাক পড়ে থাক তব ভবনদ্বারে,
    একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে,
    একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী,—তেমনি সারাদিবসরাত্রি
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মরণপরপারে—
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।

১১ই মাঘ, ১৩১৮।

সৃষ্টির অধিকার

দিনতো যাবেই—এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়েছে। কিন্তু সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে, যেটা হবার সেটা হয়নি! দিনতো যাবে, কিন্তু মানুষ কেবলি বলেচে—হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনো তার কিছুই হয় নি। তাই যদি না হয়ে থাকে তবে মানুষ আর কিসে মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? পশু তার প্রাত্যহিক জীবনে তার যে সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোন বেদনা নেই। এখনো যা হয়ে ওঠবার তা হয়নি, একথাতো তার কথা নয়। কিন্তু

মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটি রয়েছে—হয়নি, যা হবার তা হয়নি। কি হয়নি? আমি যা হব বলে পৃথিবীতে এলুম তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না। আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব —এই কথাটি জোর করে বল্‌তে পারলুম না বলেই এই বেদনা জেগে উঠচে যে হয়নি, হয়নি—দিন আমার বৃথাই বয়ে যাচ্ছে। গাছকে পশুপক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না—মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েচে যে আমি হব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ পশুপক্ষী তরুলতার সঙ্গে সমান। কিন্তু ভগবান তাকে তাদের সঙ্গে সমান হতে দেবেন না, তিনি চান যে তাঁর বিশ্বের মধ্যে কেবল মানুষই আপনাকে গড়ে তুলবে, আপনার

ভিতরকার মনুষ্যত্বটিকে অবাধে প্রকাশ করবে। সেইজন্যে তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন— তাকে উলঙ্গ করে দুর্ব্বল করে পাঠিয়েছেন। আর সকলেরি জীবনরক্ষার জন্যে যে সকল উপকরণের দরকার তা তিনি দিয়েছেন; বাঘকে তীক্ষ্ণ নখদন্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ কি তাঁর আশ্চর্য্য লীলা যে মানুষের শিশুকে তিনি সকলের চেয়ে দুর্ব্বল, অক্ষম ও অসহায় করে দিয়েছেন—কারণ এরি ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমা শক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েচে সেই-খানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্ব্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে যে একটি পরমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর সব তৈরি, চন্দ্র সূর্য্য তরুলতা সমস্তই তৈরি, কেবল মানুষকেই

তিনি অসম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন। সকলের চেয়ে অসহায় করে মায়ের কোলে যাকে পাঠালেন, সেই যে সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ হবার অধিকারী, এই লীলাই তো তিনি দেখাবেন। কিন্তু আমরা কি তাঁর এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করব? তিনি বাইরে আমাদের যে দুর্ব্বলতার বেশ পরিয়ে পাঠিয়েছেন তারি মধ্যে আমরা আবৃত থাকব—এ হলে আব কি হল? এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্ব্বলতা নেই—এই পৃথিবীর ভূমি কি নিশ্চল অটল, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে কি স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত—এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই—সমস্তই তাঁর অটল শাসনে তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি ময়ূরকে নানা বিচিত্র রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে দেননি—তার ভিতরে

রঙের একটি বাটী দিয়ে বলেছেন, তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজ্‌তে হবে। তিনি বলেছেন তোমার মধ্যে সবই দিলুম, কিন্তু তোমাকে সেই সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন করে সুন্দর করে আশ্চর্য্য করে তৈরি করে তুলতে হবে, আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না। আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনিই মরি, তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না?

কি নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্চে? প্রতিদিনের আবর্ত্তনে কি জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। আজ যা হচ্চে কালও তাই হচ্চে—একদিনের পর কেবল আর এক দিনের পুনরাবৃত্তি চলচে—ঘানিতে জোতা হয়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি—একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোনো নতুন আঘাত পাচ্চি না যাতে মনে পড়ে আমি মানুষ। এই সাংসারিক জীবনযাত্রার

প্রাত্যহিক অভ্যস্ত কর্ম্মে আমবা কি পাচ্চি, আমরা কি জড় কবছি ? এই সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এম্নি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে ? অভ্যাস, অভ্যাস— তারি জড স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি— তারি উপরে যে আমাদেব একদিন ঠেলে উঠ্‌তে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্চি। মলিনতাব উপব কেবলি মলিনতা জমা হচ্চে— অভ্যাসকে কেবলি বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্চে —এমনি করে নিজের কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে সঙ্কীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি— বিশ্বভুবনের আশ্চর্য্য লীলাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না। দেখ্‌বার বেলা দেখি—উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে জীবন-যন্ত্রের চাকা চালানো। তাঁর আলো আর ভিতরে আস্‌তে পথ পায় না—ঐ সব জিনিসগুলো আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের কাছে আস্‌বেন বলে বলে দিয়েচেন—তুমি তোমার আসন-

খানি তৈরি করে দাও, আমি সেই আসনে বস্‌ব, তোমার ঘরে গিয়ে বস্‌ব। অথচ আমরা যা কিছু আয়োজন করছি সে সব নিজের জন্যে, তাঁকে বাদ্‌ দিয়ে বসেচি। জগৎ জুড়ে শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন, কেবল একটুখানি কালো জায়গা, আমাদের হৃদয়ের সেই কালো কলঙ্কে মলিন ধূলিতে আচ্ছন্ন সেই একটুমাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আস্‌তে নিষেধ করে দিয়েচি। সেই জায়গাটুকু আমার, সেখানে আমর টাকা রাখ্‌ব, আস্‌বাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ীর ভিৎ কাটব—সেখানে তাঁকে বলি,—তোমাকে ওখানে যেতে দিতে পারব না, তোমাকে ওখান থেকে নির্ব্বাসিত করে দিলুম। তাই এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌চি যে, যে-মানুষ সকলের চেয়ে বড়, যার মধ্যে ভূমার প্রকাশ, সেই মানুষেরই কি

সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি হোল? আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—আব সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমাব ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না। তিনি বলেচেন—তোমবা কি আমাকে ডাকবে না? তোমবা যা ভোগ কবচ আমাকে তার একটু অংশ দেবে না? যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয় —তারা অনাদর সইতে পারে না; আর যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—তাঁকেই বলেচি, তোমাকে দিতে পারব না। দিনের পর দিন কি এই কথা বলে আমরা সব ব্যর্থ করি নি? একদিন আমাদের এ সংকল্প নিতেই হবে—বলতে হবে, আমার ধন জন মান, আমার সমস্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি জীবন যৌবন তোমারি জন্তে। প্রতিদিন যদি বা ভুলে থাকি, আজ একদিন অন্ততঃ বলি, তোমারি জন্ত আমার এই জীবন

হে স্বামী! তোমাকে না দিয়ে কি আমি আমাকে ব্যর্থ করলেম? না, তোমাকেই ব্যর্থ করলেম। তুমি যে বলেছিলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা অমৃতের পুত্র। তুমি যে বলেছিলে তুমি বড়, তোমার জীবন সংসারের সুখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাক্‌বে না। সেই পিতৃসত্য যে আমাদের পালন করতেই হবে, তাকে ব্যর্থ করলে যে তোমার সত্যকেই ব্যর্থ করা হবে।

সেই জন্যে, সেই সত্যকে স্বীকার করবে বলে এক একটা দিনকে মানুষ পৃথক করে রাখে। সে বলে রোজ তো ঘানি টেনেছি, আর পারিনে—একটা দিন অন্ততঃ বুঝি যে আনন্দ লোকে অমৃত লোকেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কারাগারের মধ্যে নয়। সেই দিন উৎসবের দিন, সেই দিন মানুষের আপনার সত্যকে জানবার দিন। সেই দিনকে প্রতিদিনকার দিন করতে হবে। প্রতিদিন

নিজেকে কত অসত্য করে দেখেছি, কত অসত্য করে জেনেছি—একদিন আপনাকে অনন্তের মধ্যে দেখে নিতে হবে। বিশ্বের বিধাতা হয়েও তুমি আমাব পিতা—পিতা নোঽসি—এত বড় কথা একদিন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাতেই হবে। আজ ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তির কাছে প্রণাম নয়, প্রতিদিন সেইখানে মাথা লুটিয়েছি এবং সেই ধূলি জঞ্জালেব নীচে কোন্ তলায় তলিয়ে গিয়েছি। আজ সমস্ত জঞ্জাল দুর করে দিয়ে যিনি আমার দরজায় যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে ডাক্‌ব—পিতা নোঽসি তুমি আমার পিতা। যে দিন তাঁকে ডাকব তাঁকে ঘরে নিয়ে আস্‌ব সে দিন সব ধন মান সার্থক হবে, সে দিন কোন অভাবই আর অভাব থাক্‌বে না।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে

ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে—কি করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেচেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ করতে হবে। সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এত দিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে? সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলি দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচার বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েচে? তার ঘর-ভরা শিশু, তার মা বাপ ভাই বন্ধু, আত্মীয় প্রতিবেশী—এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে? না তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব—আর সব আমি একলা করেচি, কিন্তু তোমার জন্যেই

আমার স্বর্গ সৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেচে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এত বড় একটা চরমসৃষ্টি হতে পারেনি। সর্ব্ব-শক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব্ব করেচেন, একজায়গায় তিনি হার মেনেচেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্ব্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গরচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এই জন্যে যে তিনি যুগযুগান্ত ধরে অপেক্ষা করচেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধরে অপেক্ষা করেন নি? আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন শস্য-শ্যামলা হয়েচে কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে তরল হয়ে তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেচে, তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েচে, কিন্তু স্বর্গ এখনো বাকি। বাষ্প আকারে

যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য্য ফোটেনি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কি অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েচে। ঠিক্ তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েচে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠেনি। তাঁর সেই রচনা কার্য্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েচেন, কিন্তু আমরা কেবল খাব পরব সঞ্চয় করব এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু এ ভুল্ তো ভাঙ্‌বে, মর্‌বার আগে একদিন তো বলতে হবে, এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলমে। অনেক অপরাধ স্তুপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেচি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য্য ফুটেছিল। জগৎসংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলেম? অভাবকে তো কিছু পূরণ করেচি, কিছু অজ্ঞান দূর করেচি—এই কথাটি তো

বলে যেতে হবে। এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে পড়ে থাকব। তার আগে কি বলে যেতে পারব না, কিছু দিতে পেরেছি?

আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হয়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুসী হয়ে চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, আমি ঐ সৃষ্টিতে আরো কিছু সৃষ্টি করব। শিল্পী কি করে? সে কেন শিল্প রচনা করে? বিধাতা বলেছেন, আমি এই যে উৎসবের লণ্ঠন সব আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছি, তুমি কি আলপনা আঁকবে না? আমার রসুনচৌকি তো বাজ্‌চেই—তোমার তম্বুরা, কি একতারাই না হয় তুমি বাজাবে না? সে বল্লে হাঁ, বাজাব বৈ কি! গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেমনি মিলল অমনি ঠিক গানটি

হল। আমি গান সৃষ্টি করব বলে সেই গান তিনি শোনবার জন্তে আপনি এসেচেন। তিনি খুসী হয়েচেন—মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েচেন প্রেম দিয়েচেন তা যে মিলল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে—এই দেখে তিনি খুসী। শিল্পী আমাদের মানুষের সভায় কি তার শিল্প দেখাতে এসেচে? সে যে তাঁরি সভায় তার শিল্প দেখাচ্চে, তার গান শোনাচ্চে। তিনি বললেন—বাঃ এ যে দেখছি আমার সুর শিখেচে, তাতে আবার আধ আধ বাণী জুড়ে দিয়েচে—সেই বাণীর আধখানা ফোটে আধ-খানা ফোটে না। তাঁর সুরে সেই আধফোটা সুর মিলিয়েচি শুনে তিনি বললেন—খুসি হয়েচি। এই যে তাঁর মুখের খুসি না দেখতে পেলে সে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়। যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় বসে আছে সে কিছুই নয়। কিন্তু শিল্পী কেবলমাত্র রেখার

সৌন্দর্য্য নিল, কবি সুর নিল, রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে পারা যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁরি জিনিস তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

জীবনকে তাঁর অমৃতরসে কাণায় কাণায় পূর্ণ করে যে দিন নিবেদন করতে পারব সেদিন জীবন ধন্য হবে। তার চেয়ে বড় নিবেদন আর কি আছে? আমরা তো তা পারি না। তাঁর নৈবেদ্য থেকে সমস্ত চুরি করি, কৃপণতা করে বলি নিজের জন্য সবই নেব কিন্তু তাঁকে দেবার বেলা উদ্বৃত্ত মাত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তাঁকে সমস্ত নিবেদন করে দিতে পারলে সব দরকার ভরে যায়, সব অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলচি আজ সেই জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের দিন। আজ বলবার দিন—তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই বসেছিলুম। তোমার সঙ্গে বসব এ গৌরব

ভুলে গেলুম! তোমাতে আমাতে মিলে বসবার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না? আজ এই কথা বলব—আমার আসন শূন্য রয়ে গেচে। তুমি এস, তুমি এস, তুমি এসে একে পূর্ণ কর! তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কি, আমার ধূলোর মধ্যে ভিক্ষুকের মত পড়ে থাকা যে ভালো। হায় হায় ধূলো বালি নিয়ে বাস্তবিকই এই যে খেলা করচি এই কি আমার সৃষ্টি? এই সৃষ্টির কাজের জন্যেই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল? মাঝে মাঝে কি পরম দুঃখে পরম আঘাতে এগুলো ভেঙে যায় নি? খেলাঘর একটু নাড়া দিলেই পড়ে যায়। কিন্তু তোমাতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি তা কি একটু ফুঁয়ে এমনি করে পড়ে যেতে পারে? খেলাঘর কত যত্ন করেই গড়ে তুলি, যেদিন আঘাত দিয়ে ভেঙে দেন সেদিন দেখিয়ে দেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে একলা সৃষ্টি করবার কোনো

সাধ্য আমাদের নাই। সেদিন কেঁদে উঠে আবার ভুলি, আবার ছিদ্র ঢাকবার চেষ্টা করি —এমনি করে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ এক-দিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি—হে আমার চিরদিনের অধীশ্বর, তোমাকে একদিনের জন্যেই ডাকলুম। এই জীবনে শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেছি দেখা মেলেনি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলেম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটিও যদি না দাও তবু একথা বলতে পারব না—ওগো আমি পারলুম না। আমি ক্লান্ত অক্ষম, দুর্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব পড়ে রইল—এ কথা বলব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলেম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে

খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড় দুঃখ পেয়েছি এ কথা বলবার অধিকার দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথ দুঃখের বোঝা বয়ে এসেছি—আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত এই কথাটি আজ স্মরণ করব। সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।

অসতো মা সদ্গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিললে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে। মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃত লোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করচে তেমনি আমার জীবনকে করবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ

১১ই মাঘ, ১৩২০।

ছোট ও বড়

(১১ই মাঘ সায়ংকালে লেখক কর্তৃক পঠিত উপদেশ)

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই মানুষের উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময়, যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাত-খরচের খুচরো

তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে-একটি চিরজীবনের উত্তম প্রকাশ পায় সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মত সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে এ কথা সমস্ত মনের সঙ্গে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভোগী ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মত আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর সমস্তকেই অস্বীকার করচে, অলসচিত্ত উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চিররাত্রি রচনা করে পড়ে আছে, তবু সমস্ত মত্ততা, অহঙ্কার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে যে আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে, এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়।

সেই জন্যে আমরা যাঁকে দেখলুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসার-বুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়ে ঘের দিয়ে রাখলুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বল্লেন, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ, এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব কিছু হতেও প্রিয়, তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এই জন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখলুম তিনি কোন্ অন্তহীনের প্রেমে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে মধুময় করে বিকশিত করচেন, যখন তাঁর সেবককে দেখলুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ-অপমানকে গলার হার করে তুলচেন তখন তাঁদের প্রণাম করে আমরা বল্লুম এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা, সমস্ত দ্বেষ বিদ্বেষ ভাগ

বিভাগের মাঝখানে এইটি ঘটচে—কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই যে অনন্তের বিশ্বাস, এই যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মত রয়েচে বারম্বার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হোত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু এ যে মর্ম্মের জিনিষ, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল থেকে এ যে অনির্ব্বচনীয় রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

তাই ত ইতিহাসে দেখা গেচে মানুষের চিত্ত-ক্ষেত্রে এক একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেচে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েচে, ভক্তির রসসঞ্চার শুকিয়ে গেচে, যেখানে পূজার সঙ্গীত বেজে উঠত, সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠচে। শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেচে, মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেচে সেই

মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেচে।

মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে, কেন না বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটাগাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের সমস্ত জায়গাটি ঘন করে জুড়ে বসে আমাদের চলবার পথটি রোধ করে দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য যোগায় না, তখন খররৌদ্রের দিনই শুভ-দিন—তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে, সে মরবে তখনি যখন্ আমরা মরব ; যতদিন আমরা আছি ততদিন আমাদের আত্মার খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে—মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃতলোক আছে যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সঙ্গীত

বেজে উঠচে আজ আমাদের উৎসব সেই-খানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র? এই যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে, মাথায় মুকুট নিয়ে এসেচে এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়?

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দ্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করচে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটি চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেচে, সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রস-দান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্চে; সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করচে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করচে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করচে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রসস্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব—এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্বৎসরকাল গাছ আপনার

পাতার ভার নিয়েই ত আছে; বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে; সেই দিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই দিন বোঝা যায় এতদিনকার পাতা ধরা এবং পাতা ঝরার ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আসছিল, সেই জন্যেই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্য্যে আপনাকে প্রকাশ করল।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেচে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েচি? আজ কি অন্য সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্ম্ম-জাল বুনে বুনে চলা নয়—তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য্য পরমকল্যাণ পূজার অঞ্জলির মত ঊর্দ্ধমুখ হয়ে উঠচে?

না, সে কথা ত আমরা সকলে মানিনে। আমাদের জীবনের মর্ম্মনিহিত সেই সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন এখনো হয় ত আসেনি। আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগেনি ; —কিন্তু তবুও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদেব সমস্ত অন্যমনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি, যে যেমন ভাবে আসে আসুক, যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক।

কেননা, এ ত আমাদের কারো একলার সামগ্রী নয়। আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তবসঙ্গীত উঠবে সে ত কারো একলা-কণ্ঠের বাণী নয় ; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যাঁর নাম ডেকেচে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত

কলরবের উপরে উঠেচে আমরা সেই সকল—মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েচি—কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়, কেবল এই কথাটি বলবার জন্যে—যে, তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাকতে শিখেচি মানুষের এই একটি আশ্চর্য্য সৌভাগ্য। আমবা পশুরই মত আহার বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারি মধ্যেই "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" আমরা সেই মহান্ পুরুষকে জেনেচি, সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি তাই আনন্দ করচি তা নয়। দ্বারে মৃত্যু এসেচে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেচে,

"বেদাহমেতঃ পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ"—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেচি, যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময়রূপ প্রকাশ পাচ্চেন। মনুষ্যত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা পায়ে মানুষকে চলতে হয়েচে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেচে, মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেচে, ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেচে এবং রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং, হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নমুখ সেই মুখ মানুষ দেখতে পেয়েচে। সে দেখা ত সহজ নয়, সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেচে বলেই ত তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেচে তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দ-সম্মিলন।

কিন্তু বিমুখ চিত্তও আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায়। এমন কোন মহৎ সম্পৎ মানুষের কাছে এসেছে যার সম্মুখে বাধা তার পরিহাসকুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি? তাই এমন কথা শুনি, অনন্তকে নিয়ে ত আমরা উৎসব করতে পারিনে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্বকথা মাত্র। বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে আলোকধারার আবর্ত্তন হয়ে কত শত শত বৎসর কেটে যায় সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায়? তাই ত সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মত করে ছোট করে নিই নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না।

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে। যখন উপভোগ করিনে, যখন সমস্ত প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে উপলব্ধি করিনে তখনই কলহ

করি। ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুটতে হত তাহলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত কিন্তু যে সূর্য্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এইজন্যে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা। আপন ভিতরকার প্রাণের বিকাশবেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিটিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক করে পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত। হৃদয়কে একান্ত করে অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেচি, সেইখানেই ত ঐ বাণী উঠেচে, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ, আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্চেন। এ ত তর্কযুক্তির কথা হল না—চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে, এযে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা।

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্ব-কথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করা সাজে কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন—এষঃ, এই যে তিনি, সেখানে ত-কোনো কথা বলা চলে না। "সীমা" শব্দটার সঙ্গে একটা "না" লাগিয়ে দিয়ে আমরা "অসীম" শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু অসীম ত "না" নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন "হাঁ"—তাই ত তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়—ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিসটি যেমন—কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি মুহূর্ত্তেই তার ধ্বংস হচ্চে, সে যেন মৃত্যুর মালা ; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই

আমাদের প্রাণ তার প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েচে, মৃত্যুর "না" দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্চে "হাঁ"।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্চেন তেমনি ওঁ। তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্চে সমস্ত স্খলিত হচ্চে বটে কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্চে, সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্ত্তন সমস্ত গতায়াতসত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানচি; নিরন্তর সমস্ত চলে যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করচে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখচি, কখনো আজ কখনো পাঁচদিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায়, তাঁর সম্বন্ধে আমার বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের

মধ্যে তার সম্বন্ধে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেচে ; যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখেনি, যে কাল সমাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন কি, মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করেনি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই সীমাবচ্ছিন্ন দেখাগুলিকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানে—কিন্তু সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ, কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়-জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি

করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেচেন, তাঁরাই বলেচেন, এষাস্য পরমাগতিঃ, এষাস্য পরমাসম্পৎ এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এ ত জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি! এষঃ, এই যে ইনি, এই যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমাগতি, পরমধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ:—তিনি একদিকে যেমন গতি আর এক-দিকে তেমনি আশ্রয়, একদিকে যেমন সাধনার ধন, আর একদিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

কিন্তু আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করচি বটে তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ, নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকত না। অতএব অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মত

গড়ে নিতে হবে তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলতে পারে এমন কথা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আমাব বন্ধুকে যেমন আমাব নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে হত তাহলে কখনই তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না, বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমাব চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ,—তেমনি অনন্ত-স্বরূপের প্রকাশ ও ত আমার সংগ্রহ করা উপকরণের অপেক্ষা করে নি, তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করচেন। যখনি তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করচেন তখনি তিনি আপনাকে আমাদেব অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েচেন, তাঁকে রচনা করবার বরাৎ তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ আভা ত আমারই, বনের শ্যামল শোভা ত আমারই, ফুল যে ফুটেচে,

সে কার কাছে ফুটচে ? ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সঙ্গীত উঠেছে, সে সঙ্গীত কার জন্যে ? আর এই ত রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর দক্ষিণহস্ত-ধরা বন্ধু, এই ত ঘরে বাহিরে যাদের ভালবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন ; এদের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্চে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন ; এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র আলপনা-আঁকা বরণ-বেদিটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করচেন।

এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব ? সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির

ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েচেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দনিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগল না, আমরা তাঁকে যদি ভালবাসতে না পারলুম তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কি ছিল? তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই সমস্ত তারার চুম্‌কি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিণে হাওয়াকে উতলা করে তোলে? তবে ত বলতে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েচে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্চেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বলতে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না, মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন

সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধূলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেচে তাইতে তার পেট ভরবে।

না, এ কেবল সেই সকল দুর্ব্বল উদাসীনদের কথা—যারা পথে চলবে না এবং দূরে বসে বসে বলবে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কি বলেচে, তার থেকে তুমি কি বুঝলে? সে বল্লে সে কথা ত আমাদের মাষ্টার মশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেচে যে কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাষ্টার মশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয় মাষ্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে

পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর একটা কথা বসানো, "সুশীতল" শব্দের জায়গায় "সুস্নিগ্ধ" শব্দ প্রয়োগ করা। এ পর্য্যন্ত মাষ্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেচে, যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয় নি; এইজন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না—সেও বলে আমি বুঝিনে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ সহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েচে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নদী জিনিষটা কি, তুমি কখনো কি দেখেচ? সে বল্লে, না। ভূগোলের নদী জিনিষটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেচে, এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি যে, যে নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেচে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে সেই নদীই

তার ভূগোলবিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এগজামিন পাসের নদী।

তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাষ্টার মশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এই জন্যে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নে, দেখতে পেলুম না। ওরে বোঝবার আছে কি? এই যে এষঃ, এই যে এই। এই যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়চে, এই যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রং ধরে উঠচে, কত মধু ভরে উঠচে; এই যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের

সিংহদ্বারে এসে আঘাত করচেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠচে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে; আর ঐ যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহল-ময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর-পন্থায় যাত্রা করেচে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কষা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠচে—এই ত এষঃ, এই ত এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতিদিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে বিজয়কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি—সেই সত্যংজ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তংশিবমদ্বৈতং, সেই কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীর ভাবে পূর্ণ করচেন, সেই যে অন্তহীন, জগতের আদি অন্তে পরিব্যাপ্ত, সেই যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ

যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে—পিতামাতা বন্ধু—সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোট করে আপন হাতে আপনার মত করে গড়েছি তখন কি যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না? যখন আমরা বলেছি আমাদের পরমধনকে সহজ করবার জন্যে ছোট করব তখনি আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি; তখন টুকরো কেবলি হাজার টুকরো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর থামতে চায় নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেচে; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্ম্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে

নিয়েচে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুরচারিণী ভীরু রমণীর মত স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজ-পথে বেরতে কেবলি ভয় পেয়েচে। এই কথাটি আমাদেব বুঝতে হবে যে অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয়; থামার সীমাই হচ্চে আমাদের মৃত্যু, আরোর পরে আরোই হচ্চে আমাদের প্রাণ—সেই আমাদের ভূমার দিক্‌টি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক্ নিয়ত সাধনার দিক্—সেই মুক্তির দিক্‌কে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্ব্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোট করতে গিয়ে পূজনীয়কে এক প্রকার বাদ দিয়ে বসে, তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার

ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর এক বিপদে গিয়ে পড়ে—আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতে পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে, অসীমকে কেবলমাত্র ছোট করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবলমাত্র বড় করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়, তাঁকে শুধু ছোট করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড় করে আমাদের শুষ্কতা।

অনন্তং ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোট হয়েও বড় এবং বড় হয়েও ছোট। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে ত তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনিই

আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থিমোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার একসুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করচেন, আমাদের কথা শুনচেন এবং শোনাচ্চেন, এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সর্ব্বতো-ভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনি এ কথা সত্য হয়েচে তখনি এ কথাও সত্য, অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। একদিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর এক-

দিকে অন্ত আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; একদিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর একদিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্ম্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেচে সেই পরিমাণে ধর্ম্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েচে তা নয় তা অকল্যাণ হয়েচে। এই-জন্যেই মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেচে এমন সংসার-বুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে কত নরবলি হয়েচে এবং কত নরবলি হচ্চে তার আর সীমাসংখ্যা নেই। সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্য্যন্ত কত

দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেচে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেচে এবং কুৎসিতকে বরণ করেচে। মানুষ ধর্ম্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডীর বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবী করেচে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েচে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্ম্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেচে; মানুষ যখন বড় বড় দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেচে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেচে বলে কল্পনা করেচে; কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেচি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের

দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেচে এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানবজন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মত হয় কোনো পূর্ব্ব পিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্ত-হীন পথে চলেচি। ধর্ম্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েচে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ করে রেখেচে।

কিন্তু তবু এই সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্ম্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠ্‌চে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে কেবল তার বাধা-গুলিকেই ছেদন করচে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেচে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি।

অনন্তকে একই কালে একদিকে আনন্দের দ্বারা অন্য দিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলি রসে মজে থাকতে হবে না, জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্ম্মে পেতে হবে; তাকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ একদিকে বলেচে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করচেন আবার আর একদিকে বলেচেন স তপোঽতপ্যত তিনি তপস্যাদ্বারা যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করচেন। এই দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করচেন, তিনি তপস্যা-দ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেচেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরচি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্ব্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান

শুনেছিলুম, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যেরে!" সে আরো গেয়েছিল, "আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে?" তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে। যখন শুনেচি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেচি তা নয় কিম্বা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে, যারা গাচ্চে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবে এর ঠিক কি অর্থ বোঝে। কেন না, অনেক সময়ে দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু একথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েচে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই ত নইলে মানুষ কাঁর জোরে মানুষ হয়ে উঠচে? ইহুদিদের পুরাণে বলেচে ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েচেন, স্থূল বাহ্

ভাবে এ কথার মানে যেমনি হোক্ গভীর ভাবে এ কথা সত্য বই কি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই ত মানুষকে তৈরি করে তুলচেন। সেই জন্যে মানুষ আপনার সব কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড় একটি কাকে অনুভব করচে। সেই জন্যেই ঐ বাউলের দলই বলেচে—"খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়!" আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারচি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মত চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রেরণ ও সর্ব্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করচে, এই

গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেচে।

* অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কি সম্বন্ধে বেঁধেচেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেচি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ;—তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু সেই মনের মানুষ ত আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে ত কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্চে, "আমার মনের মানুষ কেরে, আমি কোথায় পাব তারে?" সে যে কে তা ত আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না—তাকে জ্ঞানের সাধনায়

জানতে হবে; সে জানা কেবলি জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। "কোথায় পাব তারে?" কোনো বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ত পাওয়া যাবে না,—স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া—আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই ত আপনার মনের মানুষের সন্ধান করচে—এমনি করেই ত তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠচে; যতই তাকে পাচ্চে, ততই বলচে, "আমি কোথায় পাব তারে?" সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না পাওয়া। সেই পাওয়া না পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্য্য লাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি,

কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার—এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ ত কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই ত এর পূর্ণতা হতে পারে না; জ্ঞানে কর্ম্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েচে, ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেচে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে যে দিকেই মানুষ বলেচে আমি চিরকালের মত পৌঁছেচি, আমি পেয়ে বসে আছি, এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েচে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েচে, সম্পদকে হারিয়েচে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েচে। এই যে তার চির-কালের গান, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে?" এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন—"মনের মানুষ যেখানে,

বল কোন সন্ধানে যাই সেখানে?" কেন না সন্ধান এবং পেতে থাকা এক সঙ্গে; যখনি সন্ধানের অবসান তখনি উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আর এক রকম করে বলা হয়েচে। তাঁকে বলেচে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সম্বন্ধ—কোনো অনন্ত তত্ত্বকে ত পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল, এতে কি কোনো অপরাধ হল? এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল? কিছুমাত্র না। কেননা আমার ঘর ছেড়ে তিনি ত শূন্যতায় মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি যে সকল রকম করেই ভরেচেন। মাকে যখন মা বলেচি তখন পরম মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেচি—মানুষের সকল সম্বন্ধের

ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনাগোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েচে—মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক একভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েচি। আমার সেই ঘরভরা অসীমকে, আমার সেই জীবনভরা অসীমকে আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, সেইটেই আমার চরম ডাক, সেই জন্যেই আমার ঘর, সেই জন্যেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেচি, সেই জন্যেই আমার জীবনের যত কিছু জানা, যত কিছু পাওয়া। তাই ত মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেচে "পিতা নোঽসি" তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক—কিন্তু এই ডাকই মানুষ একেবারে মিথ্যা করে তোলে, যখন এই ছোট অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বড় অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা বলে পিতা বলে কেবল মাত্র আবদার করি,

আর সাধনা করবাব কিছু থাকে না—যে টুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমবা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফল লাভ কবতে চাই, অন্যায় করে তাব শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু এ ত কেবল মাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবাব জন্য ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্ব্বলতাকে লালন করবাব জন্যে তাঁকে পিতা বলা নয়। সেই জন্যেই বলা হয়েচে পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার উদ্বোধিত করতে থাক। এ বোধ ত সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বেঁধে রেখে ত চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন কবতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে দেশে সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্ম্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে,

পিতা,—সে ডাক সমস্ত অন্যায়ের উপরে বেজে উঠবে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু. পিতার বোধকে উদ্বোধিত কর যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি, যেন আমাদের প্রতিদিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়ে, সমাজের কাজে, রাজ্যের কাজে আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে ওঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুইধারে তার নানা কল্যাণকীর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেচে সেই সমগ্র মানবের সমস্তকালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেচি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ সম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ, তুমি সুখরূপে আনন্দকর তোমাকে

নমস্কার, তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর তোমাকে নমস্কার, তুমি কল্যাণ তোমাকে নমস্কার, তুমি নব নবতর কল্যাণ তোমাকে নমস্কার।

১১ই মাঘ, ১৩২০।

শান্তিনিকেতন

(অষ্টম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তিনিকেতন

ওঁ

ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্য্যের আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ"কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত করলেন। বল্লেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখ্‌লেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা

নেই—তা হাঁ এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখেনা; সে দেখে কিন্তু শোনেনা।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্ব্বত্রই সন্ধান করে দেখ্‌লেন সর্ব্বত্রই খণ্ডতা আছে সর্ব্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখ্‌চে কানও শুন্‌চে নাসিকাও ঘ্রাণ করচে। এর মধ্যে যে কেবল একটা "হাঁ" এবং অন্যটা "না" হয়ে আছে তা নয় এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় হাঁ হয়ে আছে—অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই

শান্তিনিকেতন

(দ্বাদশ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য চারি আনা

প্রকাশক

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

শান্তিনিকেতন

পূর্ণ

আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বল্লেন, আজ আমার জন্মদিন; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।

তাঁর সেই যৌবন কালের আরম্ভ, আর, আমার এই প্রৌঢ় বয়সের প্রান্ত—এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে! তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবার,

কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা নেই।

যে ছাত্র তার কলেজ-শিক্ষার প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে সে যখন শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাত হাতে কোনো ছেলেকে পাঠশালায় যেতে দেখে তখন তাকে মনে মনে কৃপাপাত্রই বলে জ্ঞান করে। কেননা কলেজের ছাত্র এ কথা নিশ্চয় জানে যে ঐ ছেলে শিক্ষার যে আরম্ভভাগে আছে সেখানে পূর্ণতার এতই অভাব, যে, সেই শিশুশিক্ষা ধারাপাতের মধ্যে সে রসের লেশমাত্র পায় না—অনেক দুঃখ ক্লেশ তাড়নায় কাঁটাপথ ভেঙে তবে সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যেখানে তার জ্ঞান নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করতে করতে আনন্দিত হতে থাকবে।

কিন্তু মানুষের জীবন বলে যে শিক্ষালয়টি

আছে তার আশ্চর্য্য রহস্য এই যে, এখানকার পাঠশালার ছোট ছেলেকেও এখানকার এম, এ, ক্লাসের প্রবীণ ছাত্র কৃপাপাত্র বলে মনে করতে পারে না।

তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারিনে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে তারাই সব চেয়ে বড় হয়ে আমার চোখে পড়চে না—এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্য আছে সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্চে।

মানুষের কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজের এইখানে একটি প্রভেদ আছে। মানুষের ভারা-বাঁধা অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য

প্রকাশ করে না। সেও সম্পূর্ণ, সেও সুন্দর। সে যদি চারা অবস্থাতেই মারা যায় তবু তার কোথাও অসমাপ্তি ধরা পড়ে না। ঈশ্বরের কাজে কেবল যে অন্তেই সম্পূর্ণতা তা নয় তার সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণতা।

একদিন ত শিশু ছিলুম, সে দিনের কথা ত ভুলিনি। তখন জীবনের আয়োজন অতি যৎসামান্য ছিল। তখন শরীরের শক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনা যেমন অল্প ছিল, তেমনি জীবনের ক্ষেত্র এবং উপকরণও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। ঘরের মধ্যে যে অংশ অধিকার করেছিলুম তা ব্যাপক নয়, এবং ধূলার ঘর আর মাটির পুতুলই দিন কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অথচ আমার সেই বাল্যের জীবন আমার সেই বালক আমির কাছে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। সে যে কোনো অংশেই অসমাপ্ত তা আমার মনেই হতে পারত না। তার আশাভরসা হাসিকান্না লাভক্ষতি

নিজের বাল্যগণ্ডীর মধ্যেই পর্যাপ্ত হয়ে ছিল।

তখন যদি বড়বয়সের কথা কল্পনা করতে যেতুম তবে তাকে বৃহত্তর বাল্য-জীবন বলেই মনে হত—অর্থাৎ রূপকথা, খেলনা এবং লজঞ্জুসের পরিমাণকে বড় করে তোলা ছাড়া আর কোনো বড়কে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করতুম না।

এ যেন ছবির তাসে ক খ শেখার মত। কয়ে কাক, খয়ে খঞ্জন, গয়ে গাধা, ঘয়ে ঘোড়া। শুদ্ধমাত্র ক খ শেখার মত অসম্পূর্ণ শেখা আর কিছু হতেই পারে না। অক্ষর-গুলোকে যোজনা করে যখন শব্দকে ও বাক্যকে পাওয়া যাবে তখনই ক খ শেখার সার্থকতা হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে ক খ অক্ষর সেই কাকের ও খঞ্জনের ছবির মধ্যে সম্পূর্ণতালাভ করে' শিশুর পক্ষে আনন্দকর

হয়ে উঠে—সে ক খ অক্ষরের দৈন্য অনুভব করতেই পারে না।

তেমনি শিশুর জীবনে ঈশ্বর তাঁর জগতের পুঁথিতে যে সমস্ত রংচং-করা কথয়ের ছবির পাতা খুলে রাখেন তাই বার বার উল্টে পাল্টে তাব আব দিন রাত্রির জ্ঞান থাকে না। কোনো অর্থ, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো তত্ত্বজ্ঞান তার দরকারই হয় না—সে ছবি দেখেই খুসি হয়ে থাকে ; মনে করে এই ছবি দেখাই জীবনের চরম সার্থকতা।

তারপরে আঠার বৎসর পেরিয়ে যেদিন উনিশে পা দিলুম সেদিন খেলনা লজঞ্জুস ও রূপকথা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। •সেদিন যে ভাবরাজ্যের সিংহদ্বারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালুম সে একেবারে সোনার আভায় ঝল্‌মল্‌ করচে এবং ভিতর থেকে যে একটি নহবতের আওয়াজ আসচে তাতে প্রাণ উদাস করে দিচ্চে। এতদিন ছিলুম বাইরে, কিন্তু সাহিত্যের

নিমন্ত্রণ-চিঠি পেয়ে মানুষের মানসলোকের রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা গেল। মনে হল, এই যথেষ্ট, আর কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এমনি করে মধ্য-যৌবনে যখন পৌঁছন গেল—তখন বাইরের দিকে আর-একটা দরজা খুলে গেল। তখন এই মানসলোকের বাহির-বাড়িতে ডাক পড়ল। মানুষ যেখানে বসে ভেবেছে, আলাপ করেছে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে সেখানে নয়—ভাব যেখানে কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সেই মস্ত খোলা জায়গায়। মানুষ যেখানে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, যেখানে অসাধ্য-সাধনের জয়পতাকা হাতে অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নদী পর্ব্বত সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেইখানে। সেখানে সমাজ আহ্বান করচে, সেখানে দেশ হাত বাড়িয়ে আছে—সেখানে উন্নতিতীর্থের দুর্গমশিখর মেঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন

থেকে সুমহৎ ভবিষ্যতের দিকে তর্জ্জনী তুলে রয়েছে। এই বা কি বিরাট্ ক্ষেত্র! এই যেখানে যুগে যুগে সমস্ত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে এসেছেন, এখানে প্রাণ আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারলেই নিজেকে সার্থক বলে মনে করে।

কিন্তু এইখানে এসেই, যে, সমস্ত ফুরোয় তা নয়। এর থেকেও বেরোবার দরজা আছে। সেই দরজা যখন খুলে যায়—তখন দেখি আরো আছে, এবং তার মধ্যে শৈশব যৌবন বার্দ্ধক্য সমস্তই অপূর্ব্বভাবে সম্মিলিত! জীবন যখন ঝরণার মত ঝরছিল তখন সে ঝরণারূপেই সুন্দর—যখন নদী হয়ে বেরল তখন সে নদীরূপেই সার্থক—যখন তার সঙ্গে চারদিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিলে তখন মহানদরূপেই তার মহত্ত্ব—তার পরে সমুদ্রে এসে যখন সে

সঙ্গত হল তখন সেই সাগরসঙ্গমেও তার মহিমা।

বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্র ছিল তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানসক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলনক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত ক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর।

আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে এই কথাই আমি চিন্তা করচি। আমি দেখচি তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর সাম্‌নে একটি অভাবনীয়, তাঁকে নব নব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করচে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পঞ্চাশে পদার্পণ করে আমার সাম্‌নেও সেই অভাবনীয়কেই দেখচি। নূতন আর কিছুই নেই, শক্তির পাথেয় শেষ হয়ে গেছে, পথের

সীমায় এসে ঠেকেছি এ কথা কোনো মতেই বল্‌তে পারচিনে। আমি ত দেখচি আমিও একটি বিপুল বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছি। বাল্যের জগৎ, যৌবনের জগৎ, যা পার হয়ে এসেছি বলে মনে করেছিলুম এখন দেখছি তার শেষ হয় নি—তাকেই আবার আর-এক আলোকে, আর-এক অর্থে, আর-এক সুরে লাভ করতে হবে মনের মধ্যে সেই একটি সংবাদ এসেছে।

এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যেখানে ছিলুম সেইখানেই আছি অথচ চলেওছি। শিশুকালের যে পৃথিবী, যে চন্দ্র-সূর্য্য তারা, এখনো তাই—স্থান পরিবর্ত্তন করতে হয়নি, অথচ সমস্তই বেড়ে উঠেচে। দাশুরায়ের পাঁচালি যে পড়বে তাকে যদি কোনো দিন কালিদাসের কাব্য পড়তে হয় তবে তাকে স্বতন্ত্র পুঁথি খুল্‌তে হয়। কিন্তু এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে—

সেই পুঁথিকে শিশু পড়চে ছড়ার মত, যুবা পড়চে কাব্যের মত এবং বৃদ্ধ তাকেই পড়চে ভাগবত। কাউকে আর নড়ে বসতে হয় নি—কাউকে এমন কথা বলতে হয় নি যে, এ জগতে আমার চলবে না, আমি এ'কে ছাড়িয়ে গেছি—আমার জন্যে নূতন জগতের দরকার।

কিছুই দরকার হয় না এইজন্যে, যে, যিনি এ পুঁথি পড়াচ্চেন তিনি অনন্ত নূতন—তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পাঠকে নূতন করে নিয়ে চলেছেন—মনে হচ্চে না যে, কোনো পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

এই জন্যেই পড়ার প্রত্যেক অংশেই আমরা সম্পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্চি—মনে হচ্চে এই যথেষ্ট, মনে হচ্চে আর দরকার নেই। ফুল যখন ফুটচে তখন সে এমনি করে ফুটচে যেন সেই চরম; তার মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা দৈন্যরূপে যেন নেই। তার

কারণ হচ্চে, পরিণত ফলের মধ্যে যাঁর আনন্দ, অপরিণত ফুলের মধ্যেও তাঁর আনন্দের অভাব নেই।

শৈশবে যখন ধূলো বালি নিয়ে, যখন নুড়ি শামুক ঝিনুক ঢেলা নিয়ে খেলা করেছি তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদিকালের ভগবান শিশু ভগবান হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করেছেন। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে শিশু না হতেন এবং তাঁর সমস্ত জগৎকে শিশুর খেলাঘর করে না তুলতেন তাহলে তুচ্ছ ধূলোমাটি আমাদের কাছে এমন আনন্দময় হয়ে উঠ্‌ত না। তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের মত হয়ে আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন—এই জন্যে শিশুর জীবনে সেই পরিপূর্ণস্বরূপের লীলাই এমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয়; কেউ তাকে ছোট বলে, মূঢ় বলে, অক্ষম বলে অবজ্ঞা করতে পারেনা—অনন্ত শিশু তার সখা হয়ে তাকে এমনি গৌরবান্বিত

করে তুলেছেন যে জগতের আদরের সিংহাসন সে অতি অনায়াসেই অধিকার করে বসেছে, কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

আবার সেই জন্যেই আমার উনিশ বৎসরের যুবা বন্ধুব তারুণ্যকে আমি অবজ্ঞা করতে পারিনে। যিনি চিরযুবা তিনি তাকে যৌবনে মণ্ডিত জগতের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল ধরে কত যুবাকেই যে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে এসেছেন তার আর সীমা নেই। তাই যৌবনের মধ্যে চবমের আস্বাদ পেয়ে চিরদিন যুবারা যৌবনকে চরমরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছে।

প্রবীণরা তাই দেখে হেসেছে। মনে করেছে যুবারা এই সমস্ত নিয়ে ভুলে আছে কেমন করে? ত্যাগেব মধ্যে রিক্ততার মধ্যে যে বাধাহীন পবিপূর্ণতা সেই অমৃতের স্বাদ এরা পায়নি। তিনি চিরপুরাতন যিনি

পরমানন্দে আপনাকে নিয়তই ত্যাগ করচেন, যিনি কিছুই চান না, তিনিই বুদ্ধের বন্ধু হয়ে পূর্ণতার দ্বার স্বরূপ যে ত্যাগ, অমৃতের দ্বার স্বরূপ যে মৃত্যু তারই অভিমুখে আপনি হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন।

এমনি করে অনন্ত যদি পদে পদেই আমাদের কাছে না ধরা দিতেন তবে অনন্তকে আমরা কোনো কালেই ধরতে পারতুম না। তবে তিনি আমাদের কাছে "না" হয়েই থাক্তেন। কিন্তু পদে পদে তিনিই আমাদের হাঁ। বাল্যের মধ্যে যে হাঁ সে তিনিই, সেইখানেই বাল্যের সৌন্দর্য্য; যৌবনের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই—সেইখানেই যৌবনের শক্তি সামর্থ্য; বার্দ্ধক্যের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই—সেইখানেই বার্দ্ধক্যের চরিতার্থতা। খেলার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, সংগ্রহের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি এবং ত্যাগের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি।

এই জন্যেই পথও আমাদের কাছে এমন রমণীয়, এই জন্যে সংসারকে আমরা ত্যাগ করতে চাইনে। তিনি যে পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। পথের উপর আমাদের এই যে ভালবাসা এ তাঁরই উপর ভালবাসা। মরতে আমরা যে এত অনিচ্ছা করি এর মধ্যে আমাদের মনের এই কথাটি আছে যে, হে প্রিয়, জীবনকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় করে রেখেছ।—ভুলে যাই যিনি প্রিয় করেছেন মরণেও তিনিই আমাদের সঙ্গে চলেছেন।

আমাদের বলবার কথা এ নয় যে, এটা অপূর্ণ, ওটা অপূর্ণ, অতএব এ সমস্তকে আমরা পরিত্যাগ করব। আমাদের বলবার কথা হচ্চে এই যে, এরই মধ্যে যিনি পূর্ণ তাঁকে আমরা দেখ্‌ব। ক্ষেত্রকে বড় করেই যে আমরা পূর্ণকে দেখি তা নয়, পূর্ণকে দেখলেই আমাদের ক্ষেত্র বড় হয়ে যায়। আমরা যেখানেই আছি, যে অবস্থায় আছি সকলের মধ্যেই যদি তাঁকে

দেখবার অবকাশ না থাকত তাহলে কেউ কোনো কালেই তাঁকে দেখবার আশা করতে পারতুম না। কারণ, আমরা যে যতদূরই অগ্রসর হইনা, অনন্ত যদি ধরা না দেন তবে কোনো কৌশলে কারো তাঁকে নাগাল পাবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না।

কিন্তু তিনি অনন্ত বলেই সর্ব্বত্রই ধরা দিয়েই আছেন—এই জন্যে তাঁর আনন্দরূপের অমৃতরূপের প্রকাশ সকল দেশে,সকল কালে। তাঁর সেই প্রকাশ যদি আমাদের মানবজীবনের মধ্যে দেখে থাকি তবে মৃত্যুর পরেও তাঁকে নূতন করে দেখতে পাব এই আশা আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানবজীবনে সে সুযোগ যদি না ঘটে থাকে, অর্থাৎ যদি না জেনে থাকি যে, যা কিছু প্রকাশ পাচ্চে সে তাঁরই আনন্দ, তবে মৃত্যুর পরে যে আরো কিছু বিশেষ সুযোগ আছে এ কথা কল্পনা করবার কোনো হেতু দেখিনে।

অনন্ত চিরদিনই সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন এই তাঁর আনন্দের লীলা। কিন্তু তাঁর যে অন্ত নেই একথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান্? নেতি নেতি করে জানান্ না—ইতি ইতি করেই জানান্। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেই একথা জানতে পারি সর্ব্বত্রই ইতি—সর্ব্বত্রই সেই এবং। জীবনেও সেই এবং, জীবনের পরেও সেই এবং।—কিন্তু তিনি নাকি অন্তহীন—সেইজন্যে তিনি কোথাও কোনো দিন পুরাতন নন, চিরদিনই তাঁকে নূতন করেই জানব, নূতন করেই পাব, তাঁতে নূতন করেই আনন্দলাভ করতে থাকব। একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মত একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম তাহলে অনন্ত পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব

এ কথনো হতেই পাবে না! কিন্তু সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতররূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন এককে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চল্‌ব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোনো অর্থই নেই, তবে বিশ্বরচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ মায়ামরীচিকামাত্র।

মাতৃশ্রাদ্ধ

আমি কোনো ইংরেজি বইয়ে পড়েছি, যে ঈশ্বরকে যে পিতা বলা হয়ে থাকে সে একটা রূপক মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সন্তানের যে রক্ষণ পালনের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্বন্ধ আছে বলেই এই সাদৃশ্য অবলম্বনে তাঁকে পিতা বলা হয়।

কিন্তু একথা আমরা মানিনে। আমরা তাঁকে রূপকের ভাষায় পিতা বলিনে। আমরা বলি পিতামাতার মধ্যে তিনিই সত্য পিতা মাতা। তিনিই আমাদের অনন্ত পিতামাতা, সেই জন্যেই মানুষ তার পৃথিবীর পিতামাতাকে চিরকাল পেয়ে আসচে। মানুষ যে পিতৃহীন হয়ে মাতৃহীন হয়ে পৃথিবীতে আসে না তার একমাত্র কারণ, বিশ্বের অনন্ত পিতামাতা চিরদিন মানুষের পিতা মাতার মধ্যে আপনাকে

প্রকাশ করে আসচেন। পিতার মধ্যে পিতারূপে যে সত্য সে তিনি, মাতার মধ্যে মাতারূপে যে সত্য সে তিনি।

পিতামাতাকে যদি প্রাকৃতিক দিক্ থেকে দেখাই সত্য দেখা হত, অর্থাৎ আমাদের মর্ত্যজীবনের প্রাকৃতিক কারণ মাত্র যদি তাঁরা হতেন, তাহলে এই পিতামাতা সম্ভাষণকে আমরা ভুলেও অনন্তের সঙ্গে জড়িত করতুম না। কিন্তু মানুষ পিতামাতার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ঢের বড় জিনিষকে অনুভব করেছে—পিতামাতার মধ্যে এমন একটি পদার্থের পরিচয় পেয়েছে যা অন্তহীন, যা চিরন্তন, যা বিশেষ পিতামাতার সমস্ত ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে; পিতামাতার মধ্যে এমন একটা কিছু পেয়েছে, যাতে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহতারাকে যিনি অনাদি-অনন্তকাল নিয়মিত করচেন সেই পরম শক্তিকে সম্বোধন করে বলে উঠেছে পিতানোঽসি—

তুমি আমাদের পিতা। একথা যে নিতান্তই হাস্যকর প্রলাপবাক্য এবং স্পর্দ্ধার কথা হত যদি এ কেবলমাত্রই রূপক হত। কিন্তু মানুষ এক জায়গায় পিতামাতাকে বিশেষ ভাবে অনন্তের মধ্যে দেখেছে, এবং অনন্তকে বিশেষ ভাবে পিতামাতার মধ্যে দেখেছে, সেই জন্যেই এমন দৃঢ় কণ্ঠে এতবড় অভিমানের সঙ্গে বল্‌তে পেরেছে "পিতানোঽসি।"

মানুষ পিতামাতার মধ্য থেকে যে অমৃতের ধারা লাভ করেছে সেইটেকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখেছে কোথাও তার সীমা নেই, দেখেছে যেথান থেকে সূর্য্যনক্ষত্র তাদের নিঃশেষহীন আলোক পাচ্চে, জীবজন্তু যেথান থেকে অবসানহীন প্রাণের স্রোতে ভেসে চলে আজ পর্য্যন্ত কোনো শেষে গিয়ে পৌঁছল না, সেই জগতের অনাদি আদি প্রস্রবণ হতেই ঐ অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে আস্‌চে; অনন্ত ঐখানে আমাদের কাছে যেমনি ধরা পড়ে

গেছেন অমনি আমরা সেই দিকেই মুখ তুলে বলে উঠেছি "পিতানোঽসি"—বলেছি, যাকেই পিতা বলে ডাকিনা কেন, তুমিই আমাদের পিতা।

তুমি যে আমাদেরই, অনন্তকে এমন কথা বল্‌তে শিখ্‌লুম এইখান থেকেই। তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য কারবার নিয়ে তুমি আছ সে কথা ভাব্‌তে গেলেও ভয়ে মরি—কিন্তু ধরা পড়ে গেছ এইখানেই—দেখেছি তোমাকে পিতার মধ্যে, দেখেছি তোমাকে মাতার মধ্যে—তাই তুমি যত বড়ই হওনা কেন, পৃথিবীর এই এক কোণে দাঁড়িয়ে বলেছি, তুমি আমাদের পিতা—পিতানোঽসি। আমাদের তুমি আমাদের, আমার তুমি আমার।

এমন করে যদি তাঁকে না পেতুম তবে তাঁকে খুঁজ্‌তে যেতুম কোন্ রাস্তায়? সে রাস্তার অন্ত পেতুম কবে এবং কোন্‌খানে? যত দূরেই যেতুম তিনি দূরেই থেকে যেতেন।

কেবল তাঁকে অনির্ব্বচনীয় বল্‌তুম, অগম্য অপার বল্‌তুম।

কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় অগম্য অপার তিনিই আমার পিতা, আমার মাতা, তিনিই আমার,—মানুষকে এই একটি অদ্ভুত কথা তিনি বলিয়েছেন। অনধিগম্য, এক মুহূর্ত্তে এত আশ্চর্য্য সহজ হয়েছেন।

একেবারে আমাদের মানব-জন্মের প্রথম মুহূর্ত্তেই। মা'র কোলে মানুষের জন্ম এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং প্রথম কথা। জীবনের প্রথম মুহূর্ত্তেই তার অধিকারের আর অন্ত নেই; তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এত বড় স্নেহ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জগতে এত তার মূল্য। এ মূল্য তাকে উপার্জ্জন করতে হয় নি, এ মূল্য সে একেবারেই পেয়েছে।

মাতাই শিশুকে জানিয়ে দিলে বিশাল বিশ্বজগৎ তার আত্মীয়, নইলে মাতা তার

আপন হত না। মাতাই তাকে জানিয়ে দিলে, নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সূত্র তাকে বেঁধেছে সেটি কেবল প্রাকৃতিক কার্য্যকারণের সূত্র নয়, সে একটি আত্মীয়তার সূত্র। সেই চিরন্তন আত্মীয়তা পিতামাতার মধ্যে রূপ গ্রহণ করে জীবনের আরম্ভেই শিশুকে এই জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিলে। একেবারেই যে অপরিচিত এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে গ্রহণ করলে— সে কে? এমনটা পারে কে? এ শক্তি আছে কার? সেই অনন্ত প্রেম, যিনি সকলকেই চেনেন, এবং সকলকেই চিনিয়ে দেন।

এই জন্যে প্রেম যখন চিনিয়ে দেন, তখন জানা-শুনা চেনা-পরিচয়ের দীর্ঘ ভূমিকার কোনো দরকার হয় না, তখন রূপগুণ শক্তি-সামর্থ্যের আসবাব আয়োজনও বাহুল্য হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞানের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওজন

করে হিসেব করে চিন্‌তে হয় না। চিরকাল তাঁর যে চেনাই রয়েছে, সেই জন্যে তাঁর আলো যেখানে পড়ে সেখানে কেউ কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না।

শিশু মা বাপের কোলেই জগৎকে যখন প্রথম দেখ্‌লে তখন কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে একটি ধ্বনি এল—এস, এস। সেই ধ্বনি মা-বাপের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে এল কিন্তু সে কি মা-বাপেরই কথা? সেটি যাঁর কথা তাঁকেই মানুষ বলেছে "পিতানোঽসি।"

শিশু জন্মাল আনন্দের মধ্যে, কেবল কার্য্যকারণের মধ্যে নয়। তাকে নিয়ে মা-বাপের খুসি, মা-বাপকে নিয়ে তার খুসি। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আরম্ভ হল। এই যে আনন্দ, এ আনন্দ ছিল কোথায়, এ আনন্দ আসে কোথা থেকে? যে পিতামাতার ভিতর দিয়ে শিশু এঁকে

পেয়েছে, সেই পিতামাতা এ'কে পাবে কোথায়? এ কি তাদের নিজের সম্পত্তি? এই আনন্দ জীবনের প্রথম মুহূর্তেই যেখান থেকে এসে পৌঁছল সেইখানে মানুষের চিত্ত গিয়ে যখন উত্তীর্ণ হয় তখনই এত বড় কথা সে অতি সহজেই বলে—পিতানোহসি—তুমিই আমার পিতা আমার মাতা।

আমাদের এই মন্দিরের একজন উপাসক আমাকে জানিয়েছেন আজ তাঁর মাতার শ্রাদ্ধদিন। আমি তাঁকে বল্‌চি আজ তাঁর মাতাকে খুব বড় করে দেখ্‌বার দিন, বিশ্বমাতার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখবার দিন।

মা যখন ইন্দ্রিয়-বোধের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন তখন তাঁকে এত বড় করে দেখবার অবকাশ ছিলনা। তখন তিনি সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিতেন। আজ তাঁর সমস্ত আবরণ ঘুচে গিয়েছে—যেখানে তিনি পরিপূর্ণ সত্য সেইখানেই আজ তাঁকে দেখে নিতে হবে।

যিনি জন্মদান করে নিজের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমাতার পরিচয়সাধন করিয়েছেন আজ তিনি মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে দিয়ে সংসারের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেই বিশ্বজননীর মধ্যে নিজের মাতৃত্বের চিরন্তন মূর্তিটি সন্তানের চক্ষে প্রকাশ করে দিন।

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি, শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্চে বিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে একটি মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে দেখা কানে শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের আড়ালে পড়ে যায়, মনে করি সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারিনে।

আমার চোখে দেখা কানে শোনা দিয়েই ত আমি জগৎকে সৃষ্টি করিনি যে আমার দেখা শোনার বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হয়ে

যাবে। যাকে চোখে দেখ্‌ছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জান্‌চি, সে যাঁর মধ্যে আছে, যখন তাকে চোখে দেখিনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানিনে, তখনো তাঁরই মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা ত ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ সেখানে তিনি ফুরিয়ে যান নি। আমি যাকে দেখ্‌চিনে, তিনি তাকে দেখ্‌চেন—আর তাঁর সেই দেখায় নিমেষ পড়চেনা।

সেই অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের দেখার মধ্যেই আজ মাকে দেখ্‌তে হবে। আজ এই শ্রদ্ধাটিকে হৃদয়ে জাগ্রত করে তুল্‌তে হবে, যে, মা আছেন, মা সত্যের মধ্যে আছেন; শোকানলের আলোকেই এই শ্রদ্ধাকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে, যে, মা আছেন, তিনি কখনই হারাতে পারেন না। সত্যের মধ্যে মা চিরকাল ছিলেন বলেই তাঁকে একদিন পেয়েছি—নইলে একদিনো পেতুম না—এবং

সত্যের মধ্যেই মা আছেন বলেই আজও তাঁর অবসান নেই।

সত্যের মধ্যেই অমৃতের মধ্যেই সমস্ত আছে এ কথা আমরা পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই যথার্থতঃ উপলব্ধি করি। যাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহপ্রেমের আমাদের জীবনের গভীর যোগ নেই তারা আছে কি নেই তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না—সুতরাং মৃত্যুতে তারা আমাদের কাছে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানেই মৃত্যুকে আমরা বিনাশ বলেই জানি।

কিন্তু এ মৃত্যুর অর্থ কি ভেবে দেখ। যে-মানুষকে আনন্দের মধ্যে দেখিনি তাকে অমৃতের মধ্যেই দেখিনি—আমার পক্ষে সে কেবল মাত্র চোখে-দেখা কানে-শোনার অনিত্য লোকেই একদিন ছিল;—যেখানে তাকে সত্যরূপে বৃহৎরূপে অমররূপে দেখতে পেতুম সেখানে সে আমাকে দেখা দেয় নি।

যেখানে আমার প্রেম সেইখানেই আমি নিত্যের স্বাদ পাই, অমৃতের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে মানুষের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ চলে যায়, মানুষের মূল্যের সীমা থাকেনা। সেই প্রেমের মধ্যে যে মানুষকে দেখেছি তাকেই আমি অমৃতের মধ্যে দেখেছি। সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে তার মধ্যে অসীমকে দেখতে পাই, এবং মৃত্যুতেও সে আমার কাছে মরে না।

যাকে আমরা ভালবাসি মৃত্যুতে সে যে থাকবে না এই কথাটা আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে;—প্রেম যে তাকে নিত্য বলেই জানে, সুতরাং মৃত্যু যখন তার প্রতিবাদ করে তখন সেই প্রতিবাদকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে এতই কঠিন হয়ে ওঠে। যে মানুষকে আমরা অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখ্‌ব কেমন করে?

মনের ভিতরে তখন একটি কথা এই

ওঠে—প্রেম কি কেবল আমারই? কোনো বিশ্বব্যাপীপ্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়? যে শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালবাস্‌চি আনন্দ পাচ্চি সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না? আমার প্রেমের মধ্যে এমন যে একটি অমৃত আছে, যে অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরন্তন সত্য—সেই অমৃত কি সেই অনন্ত প্রেমের মধ্যে নেই? তাঁর সেই অনন্ত প্রেমের সুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠিনি? যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই?

প্রিয়জনেরই মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই ত আমাদের শ্রদ্ধার দিন,—সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন

করি; আমরা বলি, মাকে দেখ্‌চিনে কিন্তু মা আছেন। চোখে দেখে হাতে ছুঁয়ে যখন বলি মা আছেন তখন সে ত শ্রদ্ধা নয়—আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেখানে শূন্যতার সাক্ষ্য দিচ্চে সেখানে যখন বলি মা আছেন তখন তাকেই যথার্থ বলে শ্রদ্ধা। নিজে যতক্ষণ পাহারা দিচ্চি ততক্ষণ যাকে বিশ্বাস করি তাকে কি শ্রদ্ধা করি? গোচরে এবং অগোচরেও যার উপর আমার বিশ্বাস অটল তারই উপর আমার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকারময় অন্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি করচে, তাকেই ত যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা করি।

সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শ্রাদ্ধের দিন। মাতার জীবিতকালে যখন বলেছি, মা তুমি আছ—তার চেয়ে ঢের পরিপূর্ণ করে বলা, আজকের বলা—যে, মা তুমি আছ। তার মধ্যে আর একটি গভীরতর শ্রদ্ধার

কথা আছে—"পিতানোঽসি।" হে আমার অনন্ত পিতামাতা তুমি আছ, তাই আমার মাকে কোনো দিন হারাবার জো নেই।

যে দিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন—সেই দিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্চে :—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নোবনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই আনন্দ-মন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য্য পর্য্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন। সত্যং—তিনি সত্য, অতএব সমস্ত তাঁর মধ্যে সত্য এই শ্রদ্ধা যে দিন

পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে সেই দিনই আমরা বল্‌তে পারি আনন্দং—তিনি আনন্দ এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ।

শেষ

গানে সম আছে, ছন্দে যতি আছে এবং এই যে লেখা চল্‌চে এই লেখার অন্য সকল অংশের চেয়ে দাঁড়ির প্রভুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দাঁড়ি গুলোই লেখার হাল ধরে রয়েছে—এ'কে একটানা নিরুদ্দেশের মধ্যে হু হু করে ভেসে যেতে দিচ্চে না।

বস্তুত কবিতা যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেন না কোনো ভাল কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না—যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে—এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত সুর সমস্ত কথা একেবারেই

ফুরিয়ে যায়, তাহলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো একটা বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রাণপণে ধুমধাম করে যে ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায়, সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায় না, তার দারিদ্র্যই সমুজ্জল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে—তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল এক দিক থেকে থামা অন্য দিক্ থেকে থামা নয়।

মানুষের জীবনের মধ্যেও এই রকম অনেক থামা আছে। কিন্তু প্রায় দেখা যায় মানুষ থাম্‌তে লজ্জা বোধ করে। সেই জন্যেই আমরা ইংরেজের মুখে প্রায় শুন্‌তে পাই যে, জিন্‌লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি।

কোনো একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে একথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই মানুষ একমাত্র গৌরবের জিনিষ বলে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

কিন্তু ভোগের বা দানের মধ্যে সঞ্চয় যখন আপনাকে ক্ষয় করতে থাকে তখন এক আকারে সঞ্চয়ের অবসান হয় বটে কিন্তু আর এক আকারে তারই সার্থকতা হতে থাকে। যেখানে সঞ্চয়ের এই সার্থক অবসান নেই সেখানে লজ্জাজনক কৃপণতা।

জীবনকে যাঁরা এই রকম কৃপণের মত দেখে তারা কোথাও কোনো মতেই থাম্‌তে চায় না, তারা কেবলি বলে, চল, চল, চল। আমার যারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়ে ওঠে না—তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।

তারা যৌবনকে যৌবন পেরিয়েও টানাটানি করে নিয়ে চলে—সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কাঠ খড় এবং চেষ্টার আর অবধি থাকে না—তা ছাড়া কত লজ্জা কত ভাবনা কত ভয়।

ফল যখন পাকে তখন শাখা ছেড়ে যাওয়াই তার গৌরব। কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি সে দীনতা বলে মনে করে তবে তার মত কৃপাপাত্র আর কে আছে।

নিজের স্থানকে অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনের মধ্যে রাখ্‌তে হবে যে, এই অধিকারকে সম্পূর্ণ করে তুলে এ'কে ত্যাগ করে যাব—এই অধিকারকে যেমন করে পারি শেষ পর্য্যন্ত টানা হেঁচড়া করে রক্ষা করতেই হবে—তাতেই আমার সম্মান আমার কৃতিত্ব এই শিক্ষাই যারা শিশুকাল থেকে শিখে এসেছে অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মত এসে জোর করে টেনে নিয়ে না যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এই জন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এই জন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।

কেন না সেই ত্যাগ বলতে ত রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে ত ব্যর্থতা বলতে পারিনে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন হয়—সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।

আমাদের দেশে বলে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।

কিন্তু সে বন ত আলস্যের বন নয়, সে যে তপোবন। সেখানে মানুষের এতকালের সঞ্চয়ের চেষ্টা, দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়,

হওয়ার আদর্শই খুব বড় জিনিষ। ধানের গাছ যখন রৌদ্রবৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বাড়ছিল সে খুব সুন্দর কিন্তু ফসল ফলে যখন তার মাঠের দিন শেষ হয়ে ঘরের দিন আরম্ভ হয়, তখন সেও সুন্দর। সেই ফসলের মধ্যে ধান ক্ষেতের সমস্ত রৌদ্র বৃষ্টির ইতিহাস নিবিড় ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে বলে কি তার কোনো অগৌরব আছে?

মানুষের জীবনকেও কেবল তার ক্ষেতের মধ্যেই দেখব, তার ফসলের মধ্যে দেখব না, এমন পণ করলে সে জীবনকে নষ্টই করা হয়। তাই বলচি মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন তার থামার সময়। মানুষের কাজের সময়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে যে জিনিষটা আদায় করি তার থামার সময়েও আমরা যদি সেই জিনিষটাই দাবী করি তাহলে কেবল যে অন্যায় করা হয় তা নয় নিজেকে বঞ্চিত করাই হয়।

থামার সময় মানুষের কাছে আমরা যেটা দাবী করতে পারি সেটা করার আদর্শ নয়, সেটা হওয়ার আদর্শ। যখন সমস্তই কেবল চল্‌চে, কেবলি ভাঙাগড়া এবং ওঠাপড়া, তখন সেই হওয়ার আদর্শটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থিরভাবে আমরা দেখতে পাইনে—যখন চলা শেষ হয় তখন হওয়াকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের এই সমাপ্ত ভাবটি এই স্থিররূপটি দেখারও প্রয়োজন আছে। ক্ষেতের চারা এবং গোলার ধান আমাদের দুইই চাই।

কেজো লোকেরা কাজকেই একমাত্র লাভ বলে মনে করে—এই জন্য মানুষের কাছ থেকে তার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত কেবল কাজ আদায় করবারই চেষ্টা করে।

যে সমাজে যে রকম দাবী সেই দাবী অনুসারেই মানুষের মূল্য। যেখানে সমাজ যুদ্ধ দাবী করে সেখানে যোদ্ধারই মূল্য বেশি, সুতরাং সকলেই আর সমস্ত চেষ্টাকে সংহরণ

করে যোদ্ধা হবার জন্তেই প্রাণপণে চেষ্টা করে।

যেখানে কাজের দাবী অতিমাত্র, সেখানে অন্তিমমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বল্লেই হয়, সেখানে কেবলি অসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে জায়গায় থামে সে জায়গায় কিছুই পায় না কেবল লজ্জা পায়,—সেখানে কাজ একটা মদের মত, ফুরোলেই অবসাদ; সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা নেই; সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শত সহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

সামঞ্জস্য

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্চি সে হচ্চে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক্, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্চে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক্, কোন জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারিদিকেই গতি এবং স্ফূর্ত্তি, স্পন্দন এবং নর্ত্তন, অথচ সর্ব্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করচে, সূর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে কোন এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই—আমরা সকাল বেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে একথা

নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেম্‌নি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য আছে; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য ত সহজ সামঞ্জস্য নয়—এ ত মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো! এই জগৎক্ষেত্রে যে সব শক্তির লীলা তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা—কেউ বা পিছনের দিকে টানে কেউবা সামনের দিকে ঠেলে, কেউ বা গুটিয়ে আনে, কেউবা ছড়িয়ে ফেলে, কেউ বা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দচ্চে, কেউবা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্ত্তে

সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সমস্ত শক্তি অসংখ্যবেগে এবং অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে, তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত ; কিন্তু এই সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখ্‌তে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্চে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তং, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে সত্য সাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে—

এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে; কখনই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্তকাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে। "এষ সেতু র্বিধরণ লোকানামসম্ভেদায়।"

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্‌গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্ব্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্ব্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই, কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি এই ধারণা

বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায় এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়াল সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়াল, সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিককালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠ্‌ল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে

অবরুদ্ধ করে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না—বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলচে, তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক, এই তাঁদের কথা ছিল, কারণ, সত্য মানুষের

পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য, এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এম্‌নি সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে এতবড় একটা বিচ্ছেদ কখনই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না, কী রাষ্ট্রতন্ত্রে, কী সমাজতন্ত্রে, কী ধর্ম্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে হৃদয়পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করে দিলে, অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল।

এখন আবার সকলে একেবারে উল্টো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনায় যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে সাধনায় সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগল। তাঁর আর সমস্তকেই খর্ব্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগ-চাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগ্‌ল এবং সেই রকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাব-বিহ্বলতা জন্মায় সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু ভগবানকে এই রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে

দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনই মানুষ এমন কথা অনায়াসে বলতে পারে যে, ভক্তিপূর্ব্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক্ না কেন তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ যেন, পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষ্যটা যাই হোক্, ভক্তির প্রবলতা দেখ্‌লেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়—কারণ প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই রকম হৃদয়াবেগেব প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয় সেখানে শক্তিপুঞ্জ একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে ত একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিককে স্ফীত করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে; তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবল-মাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চ্চায় মানুষ কখনই মনুষ্যত্বলাভ করেনা এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ্য হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মত ক্রমশই উগ্র

হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কা'কে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচার বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল;—জগদ্ব্যাপারের সর্ব্বত্রই একটা জ্ঞানের, ন্যায়ের, নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দ্দিকে ধূলিসাৎ হতে চল্‌ল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একটা বৈদিক যুগে কর্ম্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্ম্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা

জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই, দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো-প্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বল্লেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্ম্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করেনি, তার পরে যখন জ্ঞান বড় হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম্ম উভয়কে নির্ব্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াল

তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্ম্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটী সম্পূর্ণ জুড়ে বস্‌ল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোট করে দিলে, এমন কি ভাবের আবেগকে মথিত করে-তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্য্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তি-সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাক্‌তে পারে কিন্তু তার সর্ব্বাংশের ক্ষুধা একদিন না-জেগে উঠে থাক্‌তে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো

নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্ম্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্ সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্ব্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্ম্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা

সহজ কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায় তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিষ জগতে অনেক আছে—কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয় যে সত্য চায়, সে ত ভুলতে চায়না, সে পেতে চায়। কাজেই সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরতেই হবে—তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে—কিন্তু উপায় নেই—তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসামাত্র নয় কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়—এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা

আছে ;—তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয় আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে বলেছিল—ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাঁকে চেয়েছিলেন—এই জন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে, গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত্ত তিনি থাম্‌তে পারেননি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হননি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গম্ভীর

মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেই জন্যেই এদেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী!

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি একথা বুঝেছেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়েরি মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়—শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয় রসে পাওয়া যায় কেননা সমস্ত রসের সার তিনি—রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয়-দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন :—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য-প্রকাশ করতে চায় তখন বার বার ফিরে ফিরে আসে কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা, মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে ;—সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে একথা কাউকে বলে না যে, তুমি দুর্ব্বল, তোমার সাধ্য নেই, কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়,—আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে এতই নিবিড় করে দেখে যে সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না—পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক্ না এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন—আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র

আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক্ থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক্ থেকে নয় এই জন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্ম্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের ও পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনো মতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কা'কে চাচ্চেন তা ভাল করে জানবার পূর্ব্বেই

তাঁকেই চেয়েছিলেন, জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জান্‌তে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এই জন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন, পরিমিত পদার্থের মত করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্য পদার্থের মত যাঁকে না-পাওয়া যায় না—যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব্ব করতে হয় না অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না—যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট নন, যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানিনে সেও তাঁকে জানেনা। এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্চে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন ভগবৎ-পিপাসা যখন

তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল! অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগ্‌লেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌—তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্য্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্চে—সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্য্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখে-

ছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুতঃ যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন তেমনি পারস্যের সৌন্দর্য্যকুঞ্জের বুল্‌বুল্ হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনে আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোক-গুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের

সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্য্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেম্‌নি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলি রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্ম্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা

সত্ত্বেও এই রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করেনি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুখকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশ বাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্ম্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এইজন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হোক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হোক নির্জ্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি :—তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়, তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম ;—নির্জ্জনে

তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা, অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্ম্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্চে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা এ'কেই নির্দ্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে

তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। একথা মনে রাখ্‌তে হবে আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে এনেছিলুম; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্ম্মে যেখানে যথার্থ বীর্য্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্য্যাতন স্বীকার করে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ

করে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করিনি। দুর্ব্বলতা বশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্ব্বলতা এপর্য্যন্ত কেবলি বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন—তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রবল ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্ব্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারই মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতি-দুর্গের যে রুদ্ধদ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে, আপনার ধর্ম্মকে সমাজকে আপনার আচার ব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আস্‌তে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়ের সঙ্কোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠচে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য-ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্চে, সেই-খানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্চে, সেইখানেই

অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্চে এবং সেইখানেই প্রবল-বেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্চি—এই রকম সময়েই যে সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনায় ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে করে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে, যে বিশ্লিষ্টতা এদেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্ম্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলচে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ

সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদকাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সমাঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্' এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্য্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না, ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্ম্মে, কি বিষয় কর্ম্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে

সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সম্পন্ন করতেন—তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্য্যন্ত যাহাকিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, তার কোন অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার বা সৌন্দর্য্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটবড় এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে নিয়মের মধ্যে বেঁধে, কাজের মধ্যে সম্পন্ন করে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান-পর্য্যন্ত দেখা গেছে তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি—সর্ব্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসী পর্ব্বতে একবার গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম

এক দিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্ব্বত্যগৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বস্তেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করতেন—তেমনি আবার জ্ঞান আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিন খানি জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বই, কাণ্টের দর্শন ও গিবনের রোমের ইতিহাস ছিল—তা ছাড়া এদেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্ম্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের যা কিছু পরিণতি ঘট্‌চে সমস্তই মনে মনে পর্য্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্ব্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে ;—গুরুবাদ ও

অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গী-রূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্ব্বদা কি রকম জাগ্রত ছিল তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক স্ট্রীটে বাস করতেন—একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্ক স্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বল্লেন, দেখ আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্চি কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবে না।—আমি বেশ বুঝতে পারলুম শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্ত্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি

যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল— সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণ চিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্য্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় করে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত, হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক্! তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম

আকাশে অনাদি অনন্তকালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়চে, এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করচে। সকল শক্তি সকল কর্ম্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হোক্! কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্ব্বল যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্ত্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায়—সেই-খানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকে;—আমাদের দেশেও তেমনি করে

দুর্ব্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্ম্মসাধনায় ও কর্ম্ম-সাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্ব্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে ; সকল প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসঙ্গত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেল্‌চে ; নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধি ও দুর্ব্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্ব্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি, সেই জন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সঙ্কোচমাত্র বোধ

করিনে এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার চির-প্রচলিত আচার বিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেই জন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সঙ্কুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলি নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্ব্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্ব্বেই দুটি একটি করে ভক্ত বিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চম স্বরে আনন্দবার্ত্তা ঘোষণা করচে, আজ আমরা দেশের নব উদ্বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ম্ময় কল্যাণসূর্য্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

জাগরণ

প্রতিদিন আমাদের যে আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বলবেশ প'রে আমাদের সকলের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন—জাগো, আজ, আশ্রমবাসী সকলে জাগো!

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শস্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে বিশ্বের কত হাজার রকম আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠ্‌তে থাকে তখনি আমাদের জাগা;—আমাদের শক্তির

সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুইদিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারচে, বলচে জাগো। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আসচে বলচে জাগো। যেখানে সেই বড়র আহ্বানে আমাদের ছোটটি তখনি সাড়া দিচ্চে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়চে, প্রত্যেক তারটিকেই বলচে, জাগো। যে তারটি জাগচে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সঙ্গীত। যে তার শিথিল, যে তার জাগচে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সঙ্গীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হয়।

এই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগ্‌তে জাগ্‌তে এসেছি তা কি আমরা জানি! প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা কি আমাদের স্মরণ আছে? জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে—মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে? অন্তরের মধ্যে আমাদের এই যে জাগরণ, এই যে নানাদিকের জাগরণ, গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা ত এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ, যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন—তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহ-

দ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন— এই মনুষ্যত্বের মুক্তদ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করচে—সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না—ঘুমের সবল আবরণগুলি খুলে যেতে না যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল স কৃপণঃ, সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ? গোড়াতেই ত আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে—সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা! আমাদের চোখকান আমাদের হাত-পা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ করে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের মধ্যে এমন কয় জন আছে? তারপর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে— বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে—এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক

পড়েছে—যেখানে সাড়া দিচ্চে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্চে—যেখানে সাড়া দিচ্চে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্মউপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্চে, সেইখানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। মানুষের ইতিহাসে কোন্‌ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহাউদ্বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে—বল্‌চে, ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড় করে জান! বল্‌চে, নিজের কৃত্রিম-আচারের কাল্পনিক বিশ্বাসের অন্ধ-সংস্কারের তমিস্র আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না—উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও—আত্মানং বিদ্ধি।

এই যে জাগরণ, যে জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি—যে জাগরণে

আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সঙ্কোচ বিদীর্ণ করে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি—সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরব রাগিণীর প্রভাতীগান ধরেছেন—আজ আমাদের উৎসব সার্থক হোক্।

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোট আর-একদিকে অত্যন্ত বড়। যে দিকটাতে আমি কেবল মাত্রই আমি—সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি—কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা—যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সে দিকটাতে আমি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মত ছোট আর কে আছে! আর যে দিকে আমার

সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যে দিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শত সহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ির সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,—আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোক-লোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি; সেইখানে আমার চেয়ে বড় আর কে আছে! এই বড়র দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে.. নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটর দিকে কখনই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহঙ্কারের অতীত সেই আমার বড়-আমিকে সকলের চেয়ে বড়-আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড় দিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা' আর-কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্চে এই যে আমিত্ব বলে একটি জিনিষ এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানচি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগচে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্চি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই যে ঘর ভাঙাবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্চেন উনি। পৃথক্ না

হলে মিলনও হয় না। তাই দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জগৎজুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলি পরস্পর বোঝাপড়া করচে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা;—তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেলচে আর-এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্চে। এম্‌নি করে আমি এবং আমি-নার মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ার ভাঁটা চলেচে। এম্‌নি করে আমি আমাকে জান্‌চি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানচি এবং সকলকে জানচি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানচি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে বলে আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব! যেদিকে সে পৃথক্ সেইদিকে

তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ; যেদিকে সে পৃথক্ সেইদিকে তার স্বার্থ সেইদিকে তার পাপ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার ত্যাগ সেদিকে তার পুণ্য; যেদিকে সে পৃথক সেই দিকেই তার কঠোর অহঙ্কার, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্য্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আরএকদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্চে দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রার্থনা; অসতোমা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন:—

যব হম রহল রহা নাহিঁ কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ এই আমি

একদিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্যদিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্চে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চাননা, এ'কে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী; এ'কে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্চেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠ্‌চে। অথচ এই অন্তহীন আমি মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ, যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেই জন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই আমার মত তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোক-লোকান্তরের

সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেই জন্যেই আমাকে নইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নয়, সেই জন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেই জন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোট হয়ে সংসারী হয়ে সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু মানুষ আমির এই বড়দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাঁচবে কি করে? তাই প্রতিদিনের মধ্যে মধ্যে এক একটি বড়দিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখতে চায়। বড়দিনগুলি হচ্ছে সেই

প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড় দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়দিনগুলি সূর্য্যকান্ত মণির মত গাঁথা হয়ে যাচ্চে; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বল্‌ছিলুম আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে; আজ, নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সেই যোগটি ঘোষণা করবার রসন্‌চৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজ্‌চে, কেবলি বাজ্‌চে, ভোর থেকে বাজচে। আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দক্ষেত্র। কেন? কেন না, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চল্‌চে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের

সেই বড় কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সঙ্গীতটি আজ কে বাজাবেন? সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্চে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুলচেন; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদ-মিলনের ঝঙ্কারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলি উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়চে; একই ধুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্চে, এবং একই ধুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্চে।

বীণার তারগুলো যখন বাজেনা তখন

তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে মিলিয়ে দেয়—তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্য্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক, কেউবা লোহার কেউবা পিতলের তবু এক, কেউবা সরু সুরের কেউবা মোটা সুরের তবু এক—তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায়, দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হোক্ গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বীণাতে সংসারের বীণাতে প্রতিদিন তার বাঁধা চল্‌চে, সুর বাঁধা

এগচ্চে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর! তখন চেষ্টার মূর্তি কষ্টের মূর্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে এক এক সময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে!

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয় তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই—কেবলি বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি, দিনের পর দিন যে বলি খেটে মরা, কেবলি ওঠা পড়া, কেবলি অহঃ যন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া—কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিণাম নেই—কেবলি দিনযাপন মাত্র!

কিন্তু যিনি আমাদের বাজিয়ে তিনি কেবলি কি কঠিন হাতে নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সুরই

বাঁধ্‌চেন? তা ত নয়! সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কারও দিচ্চেন। কেবলি নিয়ম? তা ত নয়! তার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ! প্রতিদিন খেতে হচ্চে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই মধুর স্বাদটুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠ্‌চে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিশ্বজগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মান্‌তে হচ্চে বটে কিন্তু সেই মেনে চলবার চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠচে। দায়ও যেমন কঠোর, খুসিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার সুবিধেই হচ্চে ঐ! তিনি সব সুরের রাগিণীই জানেন। যে ক'টি তার বাঁধা হচ্চে, তাতে যে ক'টি সুর বাজে কেবলমাত্র সেই ক'টি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুল্‌তে পারেন। পাপী হোক্ মূঢ় হোক্ স্বার্থপর হোক্ বিষয়ী

হোক্, যে হোক্ না, বিশ্বের আনন্দের একটা সুরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়? তা হলেই হল; সেই সুযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝঞ্চনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা কিছু সুর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চারদিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা কোনো সুর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে অহঙ্কারের সঙ্গে যার মিল নেই—যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে, যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে, সেই সুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতি ক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে; সেই সুরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই; সেই সুরে

সত্য আমাদের দুঃসাধ্য সাধনের দুর্গম পথে অনায়াসে আহ্বান করে; সেই সুর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্ত্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই সুরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকিয়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে সুর যখন বাজেনা তখন আমরা ধূলির ধূলি, তখন আমরা প্রকৃতির অতি ভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট করে দুই হাত জোড় করে অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে

বাতাসকে আলোকে সূর্য্যকে চন্দ্রকে পর্ব্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড় বলে দেবতা বলে যখন-তখনি যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সঙ্কল্প সঙ্কীর্ণ, আমাদের আশা ছোট, আকাঙ্ক্ষা ছোট, বিশ্বাস ছোট, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোট। তখন কেবল খাও, পর, সুখে থাক, হেসে খেলে দিন কাটাও এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার সুর যখনি বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে তখনি কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্য্যের দর্শক, জগৎঐশ্বর্য্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দ-ভাণ্ডারের অংশী—তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভীষণ সঙ্গীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃতলোকে জাগ্রত হই! আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি, মর্ত্ত্যজীবনকে অনন্ত-জীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়—লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে! কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে কত কালে, সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখ দুঃখের, জন্ম মৃত্যুর আলোক অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত অভিঘাতে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! ধন্য আমার প্রাণ, যে, সেই অনন্ত আনন্দ-সঙ্গীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে

আছে ; এই আমিটুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মীড়ের পর মীড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্য্যের আলোয় বাজ্‌চে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্চে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠ্‌চে ; সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মত এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌চে। কি সুন্দর আমি! কি মহৎ আমি! কি সার্থক আমি!

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মন প্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে তুলে ধরে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রতিদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে, বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার

বাজতে থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সঙ্কোচ নেই; কোথাও সঙ্কোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই;—স্বার্থের সঙ্কোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সঙ্কোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সঙ্কোচ—কিছুমাত্র না! সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্ করচে তার উপর বিশ্বপতির আঙুল যখন যেম্‌নি এসে পড়চে অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ ঠিকটি বেজে উঠ্‌চে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্চে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্ম্মরিত হয়ে উঠ্‌চে, পশু পক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিল্‌চে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্চে না; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে সকল ধর্ম্মে তার উদার আত্মবিস্মৃত আনন্দ, সূর্য্যের সহস্র কিরণের মত অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়চে। সর্ব্বত্রই সে জাগ্রত,

সে সচেতন, সে উন্মুক্ত ; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলে ই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দ-রূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানিনে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যত দিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জানচি, ছোট চিন্তায় ছোট বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্চে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্ম্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারিদিকে শ্রী নেই, ততদিন তোমার জগদ্ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্চে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার

অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করছি ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই, ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলে গণ্য করি, ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারিনে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই, ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মত আপনাকে কেবলি পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে চাই ; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলিনে, ধর্ম্ম বাঁচিয়ে চলিনে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলিনে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারিদিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না—চতুর্দ্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্য-বিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি

আমার আত্মা পরিপূর্ণশক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্ব্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি—কঠিন এবং প্রবল সঙ্কল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারিনে;—কী অব্যবস্থাকে কী অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে প্রস্তুত হইনে পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারিনে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে মনে গৃহে গ্রামে সমাজে স্বদেশে সর্ব্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব

ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগরণের দিন হোক—আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্বোধনের বিপুলবাণী উদ্‌গীত হতে থাক্, আমরা অতি দীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ম্ময় লোকে নিজেকে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে অনুভব করি, আনন্দ-সঙ্গীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-চেষ্টায়, হে রুদ্র! তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক! আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল—তোমার আশীর্ব্বাদে লাভের জন্য

দাঁড়িয়েছি ; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্য্যের আলোক, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আমাদের মন্ত্র, অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই, আমরা মান্‌বনা পরাভব, আমরা জান্‌বনা অবসাদ, আমরা কর্‌বনা আত্মার অবমাননা, চল্‌ব দৃঢ়পদে, অসঙ্কুচিত চিত্তে—চল্‌ব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত করে—তোমার বিশ্ব-লোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাকবে, চারিদিক থেকে আহ্বান আস্‌তে থাকবে, এস, এস, এস,—আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চিরজীবনের সিংহদ্বার—কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ—অন্তরে বাহিরে কল্যাণ,—আনন্দং আনন্দং, পরিপূর্ণমানন্দং !

NOTES AND SKETCHES

NEW SOUTH WALES,

A RESIDENCE IN THAT COLONY FROM 1839 TO 1844.

BY

MRS. CHARLES MEREDITH.

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.

1844.
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.

1844.